বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

দশম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা-একাদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা
মে-আগষ্ট 1987 □ তিন টাকা

শ্রমিক উদ্যোগে হাসপাতাল

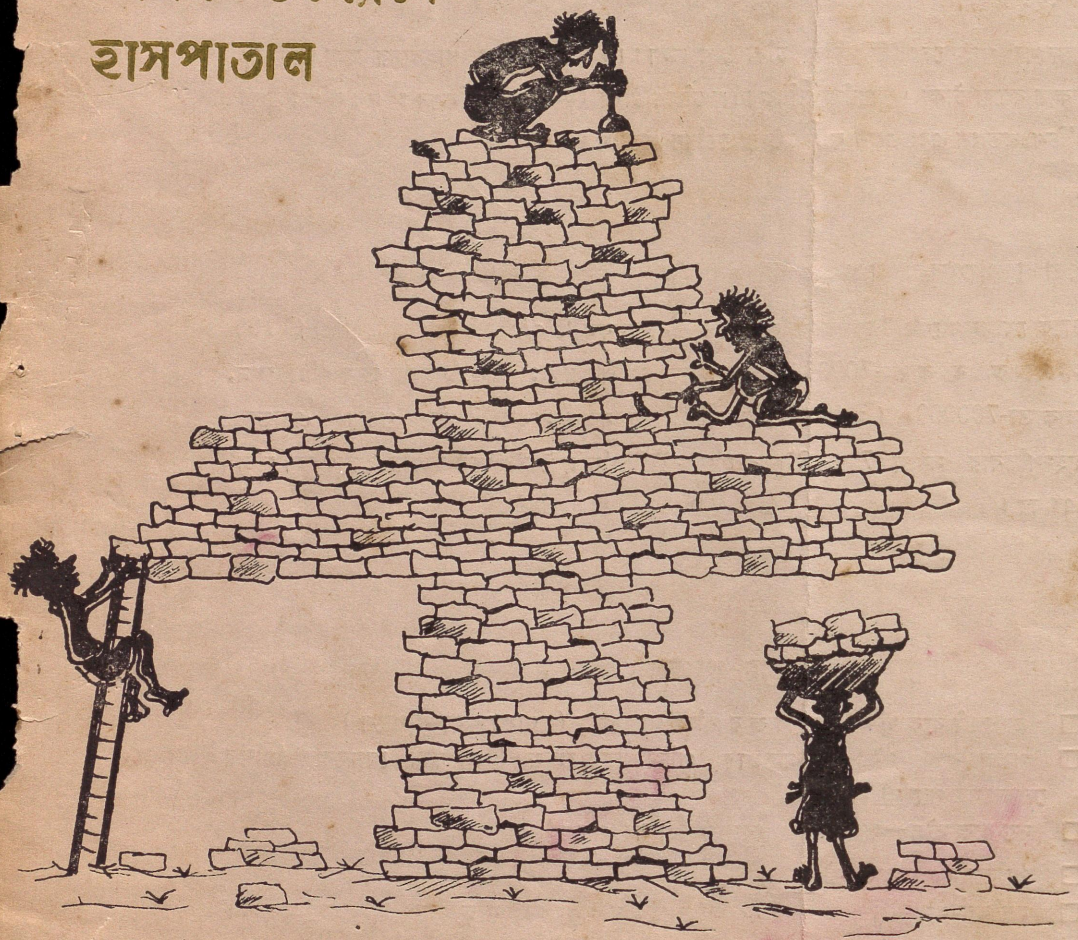

শ্রমিক উদ্যোগ
শহীদ হাসপাতাল
পরমাণু শক্তি
প্রশাসনিক ফাঁস
বি-ও-বি'র দশ বছর
আগামী দিনের প্রস্তুতি
"স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ"
বি-ও-বি ও গণবিজ্ঞান
হিরোশিমা স্মরণ
একটি স্মরণীয় বই
শিল্পে দূষণ
দমদম জুটপুরের আন্দোলন
প্রতিবেদন
মন্দির বাজার কারখানা
আগামী সংখ্যায়
প্রসঙ্গ ঃ কম্প্যুটার

বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক দ্বিমাসিক

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

মে-আগষ্ট 1987

দশম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা
ও
একাদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা

এই সংখ্যার বিষয়

1 বি-ও-বি'র কথা

2 শ্রমিক উদ্যোগে শহীদ হাসপাতাল
□ শান্তনু ত্রিবেদী

5 পরমাণু সাম্রাজ্যের অন্দরমহল

6 'পরমাণু বোমা কোনো জবাব হতে পারে না'
□ বিবৃতি

8 অর্ধেক আকাশের নক্ষত্রেরা
□ স্বরূপ গুপ্ত

12-26 'বি-ও-বি'র দশ বছর (ক্রোড়পত্র)

12 আগামী দশ বছরের জন্য পস্তুতির পক্ষে
□ দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী

15 'বি-ও-বি'র এক দশক "স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ"
□ সুব্রত ভট্টাচার্য

19 বি-ও-বি'র বন্ধুদের প্রতি
□ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

20 গণবিজ্ঞান আন্দোলন ও 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'
□ দিলীপ হোতা

25 দশ বছরের সূচী 'নিউক্লিয়ার বিতর্ক'
□ সংকলন

27 জ'পুরে রাসায়নিক দূষণ
□ বরেন ভট্টাচার্য
□ বি-ও-বি'র পক্ষে তাপস ঘোষ

31 গ্রন্থ পরিচিতি
□ সৌমেন গুহ

প্রচ্ছদ
□ সুপর্ণ চৌধুরী

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর গ্রাহকদের প্রতি

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। পত্রিকা ডাকে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"—এই নামে ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্‌ট বা মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। নীচে ঠিকানা দেওয়া হল।

বিদেশের গ্রাহক এবং প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

বিদেশের গ্রাহকদের বাৎসরিক চাঁদা দশ ডলার। বাংলাদেশের গ্রাহকদের জন্য ভারতীয় টাকায় বারো টাকা। প্রাতিষ্ঠানিক চাঁদা চল্লিশ টাকা। এজেন্ট কমিশন : দশ কপির উপর পঁচিশ শতাংশ এবং একশ কপির উপর তেত্রিশ শতাংশ।

যোগাযোগের ঠিকানা

ডাকে যোগাযোগের ঠিকানা 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী', c/o অভিজিৎ লাহিড়ী, EC 106 সল্ট লেক, কলকাতা-700064। সাক্ষাতে যোগাযোগ : 2/1A আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা-700009। (সুকিয়া স্ট্রীটে ঢুকে) সোমবার সন্ধ্যা 7 টার পর। এছাড়া বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা 7টা—8টা কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসের তিন তলায় 'ইয়ুথ হোস্টেল' -এর ঘর।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী যেখানে পাবেন

- □ বাসন্তী বুক স্টল—শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় (ঘোষ কেবিনের পাশে)
- □ পাল বুক স্টল—শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় (হরিদাস মোদকের মিষ্টির দোকানের পাশে)
- □ দত্ত বুক স্টল—বাগবাজার (দ্বারিক ঘোষের পাশে)
- □ পাতিরাম—কলেজ স্ট্রীট
- □ মহীন্দর বুকস্টল। কে সিং। নন্দীকিশোর (নানকা)। শম্ভু মন্ডল। মহেন্দ্র মন্ডল। কলেজ স্ট্রীট (পাতিরামের সামনে ফুটপাতের স্টলগুলোতে)
- □ মা কালী বুক স্টল—শ্রীমানি মার্কেটের বিপরীতে বিধানসরণীতে।
- □ ঘোষ বুক স্টল—বিধান সরণী (বিদ্যাসাগর কলেজের কাছে)
- □ রাণা'র দোকান—কলেজ স্কোয়ারের উল্টো দিকে।
- □ দমদম স্টেশন। শিয়ালদহ স্টেশনের স্বপন, পঙ্কজ ও চঞ্চলের বুকস্টল।
- □ অহনায়ন—গড়িয়াহাট মোড়
- □ রায়গঞ্জ সাইন্স ক্লাব।

বি-ও-বি'র কথা

আজ থেকে দশ বছর আগে জন্ম 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার। তার বছর দুই আগে থেকে কিছু বিজ্ঞানকর্মীর উদ্যোগে শুরু হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার কাজকর্ম। এই সংস্থারই মুখপত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ছিল বি-ও-বি। তখন আশা ছিল, একটা জনবিজ্ঞান আন্দোলনের শরিক হবে বি-ও-বি, হবে মতামত প্রকাশের, অভিমত গঠনের মঞ্চ।

কালক্রমে বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার কাজ-কর্মের ধারা অনেক ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে। এ রাজ্যে জনবিজ্ঞান আন্দোলনের প্রয়াস যে ভাবে শুরু হ'য়েছিল সেটাও থিতিয়ে এসেছে অনেকটা। বিজ্ঞানকর্মীদের সক্রিয় নানান অংশ থেকে বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা তথা বি-ও-বি অনেকটা বিচ্ছিন্ন এখন।

তবু বি-ও-বি'কে সাধ্যমত সজীবতা দেওয়ার চেষ্টা করে এসেছে বি-ও-বি'র বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা। এই চেষ্টারই ফলে বড় কোনো উদ্দেশ্য সাধন করতে না পারলেও দশটা বছর অন্তত টিকে রয়েছে বি-ও-বি। অন্তত কিছু মানুষ বি-ও-বি'র মাধ্যমে যুক্ত থাকতে পেরেছি একটা মানসিক চর্চ্চার সঙ্গে, চেষ্টা করেছি কিছু বিষয়কে জানতে, বুঝতে, জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক্ষেত্রে সেই জানা বোঝাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজে লাগাতে। এই ভাবে পরস্পরের কাছা-কাছি হয়েছি কিছু মানুষ—কাছাকাছি হতে পেরে ভাল লেগেছে। কখনো বিমর্ষ হয়েছি—ভেবেছি শুধু অস্তিত্বের বোঝা টেনে চলাই কি বি-ও-বি'র কাজ? তবু সব মিলিয়ে বি-ও-বি একটা জায়গা করে নিয়েছে আমাদের মনে, মান-সিকতায়। বি-ও-বি'র দশ বছরে তাই, কিছুটা আনন্দ হচ্ছে বৈকি। সেই আনন্দেরই ঝোঁকে এবারের সংখ্যায় বেরুচ্ছে ক্রোড়পত্র "বি-ও-বি'র দশ বছর"। থাকছে বি-ও-বি'র বন্ধুদের লেখা কয়েকটি মূল্যায়ন—বি-ও-বি'র অতীত ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মতামত। সব কটি লেখারই মতামত লেখকদের একান্ত নিজস্ব—সম্পাদক-মণ্ডলী'র কোনো হাত পড়ে নি সেগুলির উপর। কারণ এই সব মতামতের মধ্যে দিয়েই বি-ও-বি বুঝে নিতে চায় নিজের দুর্বলতার জায়গাগুলোকে, আর পাঠককে জানাতে চায় তার পরিচয়। আগামী সংখ্যাগুলিতেও চলবে এ প্রয়াস। দশ বছর পূর্তিকে উপলক্ষ্য করে চলবে বি-ও-বি'র আত্মবীক্ষণ। এবারের লেখাগুলিতে থাকছে বি-ও-বি'র সাবিক মূল্যায়ন। পরবর্তী পর্যায়ে প্রধানত থাকবে এক একটি বিষয় ধরে সেই বিষয়ের উপর গত দশ বছরের লেখা-গুলির আলোচনা।

ক্রোড়পত্রের বাইরের লেখাগুলির ভিতর 'শহীদ হাসপাতাল' এক অসাধারণ তাৎ-পর্যপূর্ণ উদ্যোগের পরিচয়পত্র। এছাড়া থাকছে কিছু প্রতিবেদন, ফিচার, আর থাকছে নিউক্লিয়ার কার্যক্রমের উপর কয়েকটি লেখা, বই-পরিচিতি। আগস্টের ছয় তারিখ সারা পৃথিবীতে চিহ্নিত হয় 'হিরোসিমা দিবস' ব'লে। মনে আছে, পাঁচ বছর আগে এই দিবস উদযাপনে এ রাজ্যের বহু মানুষ একত্র হ'য়েছিলেন। এবং এই একত্র হওয়া থেকে সূচনা হয়ে'-ছিল জনবিজ্ঞান আন্দোলনের নানাবিধ প্রয়াসের। বি-ও-বি একাধিকবার হিরোসিমা দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশ করেছে নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি বিরোধী নানাবিধ লেখার সংকলন। এছাড়াও বি-ও-বি'র বহু সংখ্যায় নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির নানান দিকের সমালোচনা ও সংশ্লিষ্ট প্রচুর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে অনেকগুলি নিবন্ধে। সেগুলির একটি পূর্ণ সূচী প্রকাশিত হলো এ সংখ্যায়।

দল্লীরাজহরার শ্রমিকদের নিজেদের উদ্যোগে গড়া—শহীদ হাসপাতাল। সরকারী বেসরকারী আর পাঁচটা সংস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা—মনে হয়, অবিশ্বাস্য। তবু এ হাসপাতাল চলছে ... শ্রমিকদেরই উদ্যোগে।

শ্রমিক উদ্যোগে শহীদ হাসপাতাল

শান্তনু ত্রিবেদী

এগারোটি তাজা প্রাণ—সংগঠিত হওয়ার প্রেরণা

1977 সাল, বোনাসের দাবীকে কেন্দ্র করে এক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের সূত্রে দল্লীরাজহরার লোহাখনির সাড়ে সাতহাজার ঠিকেদারী শ্রমিক গতানুগতিক ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে তাদের নিজস্ব ইউনিয়ন গড়ে তোলে,—"ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘ"। এই আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারাল দিশোর সুদামা, অনুসুইয়া বাই, জগদীশ, সমারু সহ এগারোজন শ্রমিক। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অগণিত অসংগঠিত বিদ্রোহী ঠিকে শ্রমিকের জীবনে যা ঘটে, তারই পুনরাবৃত্তি মাত্র।

দল্লীরাজহরার সাধারণ মানুষ কিন্তু এখনও ওঁদের ভোলেন নি। আর ভোলেননি বলেই ভিলাই স্টীল প্ল্যান্টের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঠিকা শ্রমিক আর সংলগ্ন গ্রামের মানুষজন একত্রে 1980 সালে যে হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তার নাম দিয়েছিলেন "শহীদ হাসপাতাল"—ঐ এগারোজনের বীরত্বের কথা স্মরণে রেখেই।

"ছত্তিসগড়" মাইন্স শ্রমিক সংঘের সদস্য সংখ্যা এখন দল্লীরাজহরাতেই প্রায় আট হাজার। ওঁদের একটাই পরিচয়—কনট্রাক্ট লেবার। আর ঐ পরিচয়ই বুঝিয়ে দেয় ওঁদের অধিকাংশই দল্লীরাজহারার দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দা। থাকেন আশপাশের গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ওরা খনি কেটে লোহা যোগায় ভিলাই স্টীল প্ল্যান্টে,—সভ্যতার ভিতকে মজবুত রাখতে, প্রগতির চাকাকে দুরন্ত বেগে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে। অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্তও ওদের স্থায়ী চাকুরী ছিল না, ছিল না চাকুরীক্ষেত্রে কোন প্রকার নিরাপত্তা, যদিও দীর্ঘ লড়াইয়ের পর দল্লীরাজহরার ঠিকেদারী শ্রমিকরা আজ অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ সুবিধা আদায় করেছেন। তবু আজও ওঁদের বৈধ বাসের জমি নেই, বাসযোগ্য ঘর নেই, পড়াশোনা চিকিৎসার ভাল সুযোগ নেই। অথচ ভিলাই স্টীল প্ল্যান্টের নিজস্ব কর্মীদের জন্য আছে কোয়ার্টার, গ্রাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইনসিনেটিভ, বোনাস, এল. টি. সি, ফেস্টিভেল লিভ সহ হাজারো ব্যবস্থা।

দল্লীরাজহরা দুর্গ থেকে মাত্র আশি কিলোমিটার। ভিলাই স্টীল প্ল্যান্টের (BSP) খনি এলাকা। অথচ ভিলাই-এর পরিবেশ, মানুষজন সমস্ত কিছুর থেকে আলাদাভাবে গড়ে ওঠা একটা আধা গ্রাম, আধা শহর এলাকা। ওখানে বৈভব, এখানে দারিদ্র্য—সব অর্থেই।

আরো মৃত্যু,—নূতন উদ্যোগ

কুসুম বাঈ, ঐ শ্রমিক সংঘের সহ সভাপতি মহিলা শ্রমিক। ঐ BSP-এর কনট্রাক্ট লেবার। 1978 সালে মারা গেলেন সন্তান প্রসবের সময়ে সঠিক চিকিৎসার অভাবে। তাঁর প্রথমে চিকিৎসা হয় স্থানীয় হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছে এবং পরে ভিলাই স্টীল প্ল্যান্টের আধুনিক হাসপাতালেই। তবু ভুল চিকিৎসাতেই তিনি মারা গেলেন,—যেমনভাবে মারা গেছেন এর আগেও বহুজন, বহুবছর ধ'রে। তবুও ওখানকার মানুষ ঐসব হাতুড়ে ডাক্তারবাবুদের উপর নির্ভর করতেই বাধ্য হন। কারণ যদিও আজ রাজহরার কন্ট্রাক্ট লেবাররা ভিলাই স্টীল প্ল্যান্টের হাসপাতালের চিকিৎসার সুবিধা লড়াই করে অর্জন করতে পেরেছেন,—কিন্তু আঁদের আত্মীয় পরিজনদের, গ্রামের অন্যান্য মানুষদের, এমনকি শহরের অন্যান্য শ্রমিকদেরও এ সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার নেই। তাছাড়া ভিলাই এখান থেকে অনেক দূর, পরিবহন ব্যবস্থাও ভাল নয়। অসুস্থ ব্যক্তিকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া রাতবিরেতে দূরের কথা, দিনের বেলাতেও খুব কষ্টসাধ্য।

এইভাবেই চলছিল দিনের পর দিন, একটার পর একটা প্রাণ যাচ্ছিল নিভে, জমা হচ্ছিল ছোট ছোট বেদনা, হতাশা। পুঞ্জীভূত হচ্ছিল ক্ষোভ।

> "শহীদ হাসপাতালের উপস্থিতি সরকারী মহলেও বেশ ভক্তি ও ভীতির সৃষ্টি করেছে: তাই প্রতিযোগিতায় BSP এবং সরকারী হাসপাতালের দ্রুত সম্প্রসারণে বাধ্য হচ্ছে কর্তৃপক্ষ!"

কুসুমবাঈ-এর মৃত্যু ওদের পথ দেখাল। গড়ে উঠল নিজেদের হাসপাতাল বানানোর বাসনা।

অভিনব সাফাই আন্দোলন

1981 সালের কোন একদিন এগারো ট্রাক ময়লা নিয়ে কয়েক হাজার শ্রমিক BSP-এর আধিকারিকের বাড়ীতে পৌঁছয়। সমস্ত ট্রাকের ময়লা তাঁর ঘরের দরজার সামনে ফেলে দেবার হুমকী দেখিয়ে তাঁকে বাধ্য করে শ্রমিক বস্তীগুলো দৈনিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বন্দোবস্ত করতে। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় সেই মজদুর ইউনিয়ন। সাফাই আন্দোলনের সফলতা তাঁদের আরো উৎসাহিত করে। গড়ে উঠল হেলথ্ কমিটি। হেলথ্ কমিটির কাজ শুরু হয়েছিল প্রতি সপ্তাহে শ্রমিকদের নিয়ে ছোট ছোট মিটিং, গ্রুপ ডিসকাসন ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানানোর মধ্য দিয়ে। কলকাতা থেকে আগত কয়েকজন কমবয়সী চিকিৎসক এসব ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। আর ছিলেন শংকর গুহ নিয়োগী—বহু ব্যাপারেই তিনি প্রথম থেকেই সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন নানাভাবে।

ক্রমে স্বাস্থ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু ছোট ছোট আলোচনা সভা, ওয়ার্কশপ, মিটিং আশপাশেও বিভিন্ন গ্রামে, শ্রমিক বস্তিতে চলতে থাকে।

পরিচ্ছন্নতা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, পানীয় জল, মাতৃ জঠরে ভ্রূণের ক্রমবিকাশ, সুষম খাদ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা পোস্টার, স্লাইড ইত্যাদি তৈরী বা জোগাড় হ'তে থাকে। স্থানীয় মানুষজন বেশী বেশী করে ঐসব বিষয়ে আলোচনায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে থাকেন। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন সাধারণ গ্রামবাসী, শ্রমিক সকলেই আস্তে আস্তে একটা নিজস্ব হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করতে থাকেন আরো তীব্রভাবে।

1982-তে গাড়ী রাখার ছোট্ট গ্যারেজে একটা ছোট ডিসপেন্সারী চালু হয়। সেখানে ছোটখাট অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার চিকিৎসা চলত। রুগী ভর্ত্তি রাখার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ঐ ডিসপেন্সারীর দুজন ডাক্তার বাদে বাকী সকলেই ছিলেন ঐ অঞ্চলের খনি কর্মী। তাঁদের মধ্য থেকেই পরবর্তী-কালে কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী তৈরী হয়। ঐ ডিসপেন্সারীকে ঘিরেই তখন জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারে প্রচারের কাজটাও চলতে থাকে। আর চলতে থাকে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতালের জন্য পাকা বাড়ী তৈরীর উদ্যোগ। সাত হাজার পাঁচশো শ্রমিক বিভিন্ন সময়ে নিজেদের মাহিনা থেকে এক দিনের টাকা দিয়ে অথবা কোন সফল আন্দোলনের শেষে পাওয়া থোক-টাকার কিছু অংশ দিয়ে হাসপাতাল তৈরীর একটা বড়সড় ফান্ড গড়ে তোলে। কিছুদিনের মধ্যেই ঐ সব শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ শ্রম আর অর্থে তৈরী হয় একটা একতলা পাকাবাড়ী। 1983তে 15টা বেড নিয়ে প্রথম হাসপাতাল চালু হয় ঐ বাড়ীতে। ঐ সময় থেকেই সিস্টারদের ট্রেনিং দেওয়াও শুরু হয়। সাত মাসের ট্রেনিং। 1 মাস—3মাস—3 মাস এই ভাবে ট্রেনিং কোর্সটা ভাগ করা। সাত মাস পর সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

মূলত BSP হাসপাতালে চিকিৎসার সুবিধা পান না যাঁরা সেই গ্রামের মানুষ আর BSP-এর সাথে যুক্ত নন যে সব শ্রমিক তাঁদের জন্যই ফান্ড থেকেও হাসপাতালকে টাকা দেওয়া হয়ে থাকে।

BSP-র হাসপাতাল অনেক দূরে। ওখানে ভীড় খুব বেশী, ওখানে দল্লীরাজহরার ঠিকা শ্রমিকদের প্রতি অবহেলার মনোভাব স্পষ্ট, এছাড়াও কিছুটা মতাদর্শগত একতাবদ্ধতা ও নিজের হাতের গড়া,—এসব কারণেই বোধ হয় শহীদ হাসপাতালকেই দল্লীরাজহরার সাধারণ মানুষ নিজের হাসপাতাল বলে মনে করে, এ হাসপাতালে চিকিৎসিত হতেই ওরা বেশী ভালবাসে।

তাই এখন (1987) বেডের সংখ্যা 40-এ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। আউটডোরে গড়ে 100-150 জন রুগী আসে। সকলের সুবিধার কথা ভেবে নিজেরাই সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা আউটডোর খোলা রাখার ব্যবস্থা করছেন। রুগীদের প্রতিদিনকার খাবার বাড়ী থেকেই দিয়ে যেতে হয়। যাদের অনেক দূরে বাড়ী তাঁদের আত্মীয়স্বজন হাসপাতাল চত্বরের কাছে-পিঠেই শুকনো কাঠ-পাতা জেবলে খাবার বানিয়ে নেন। অতি দুঃস্থদের জন্য কখনো-সখনো ইউনিয়ন মেস থেকেই খাবার সরবরাহ করা হয়। এ-ছাড়া লক-আউট স্ট্রাইক ইত্যাদি চলাকালে 'উধারী'তে (ধারে) চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হয়। কোন কোন সময়ে গ্রামের শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকেও চিকিৎসার খরচাপাতি দিয়ে দেওয়া হয় বা তাদের রেকমেন্ডেশনে কাউকে কাউকে কম পয়সায় বা বিনা পয়সাতেও চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হয়।

হাসপাতালের স্টাফ বলতে কুমারীবাঈ সহ পাঁচজন সিস্টার, পুণ্যব্রত গুণ, শৈবাল জানা সহ পাঁচজন ডাক্তার, নরসুতুরাম মদন সহ চার জন পুরুষ-কর্মী ও এবল সিং, জগগু, বরসাইতরাম সহ পাঁচজন স্বাস্থ্যকর্মী। এছাড়াও আছেন তিনজন ট্রেনী। সিস্টাররা ঐ অঞ্চলেরই শ্রমিক বস্তির ট্রেনিংপ্রাপ্ত মেয়ে। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনা অষ্টম শ্রেণী থেকে স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত।

> "নামকরা সমস্ত হাসপাতালের থেকেই আমাদের হাসপাতাল অনেক অনেক ছোট। ছোট বিল্ডিং, ছোট ছোট সাধারণ সাধারণ যন্ত্রপাতি, অনেক কম ডিগ্রিধারী ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী। এখানকার প্রশাসন সকলের বোধগম্য, সহজ সরল' একেবারেই "গ্রাম্য",—তাই একে এত ভালবাসি, এর প্রতি টান।"

> "এখানে চিকিৎসা করা ব্যাপারটাই অনেক চ্যালেঞ্জিং, অনেক ইন্টা-রেস্টিং। এখানে ওষুধ লিখতে হয় মেপে মেপে, ভেবেচিন্তে। যথেচ্ছ টনিক, ভিটামিন বা অন্য কোন নামীদামী অপ্রয়োজনীয় ওষুধ লেখা চলে না কোন ভাবেই।"

শহীদ হাসপাতাল। তবে খাদানের ঠিকাদারী শ্রমিক, তাঁদের আত্মীয়-স্বজন এমনকি BSP-এর সাথে সরাসরি যুক্ত কর্মচারীরাও এখানকার সুযোগ পেতে পারেন প্রয়োজনে।

হাসপাতাল চালু হওয়ার দিনই সকলে একমাসের ভাতা থেকে একটা ট্রাক কিনে হাসপাতালের জন্য দেন। ঐ ট্রাক থেকে অর্জিত সমস্ত টাকাই ঐ হাসপাতালের বিভিন্ন খাতে ব্যয় হয়। এ ছাড়া প্রতিদিন রুগীদের কাছ থেকেও কিছু টাকা পাওয়া যায়। কারণ এটি দাতব্য হাসপাতাল নয়। প্রতিটি বেডের জন্য দিন প্রতি 3 টাকা করে দিতে হয়। ওষুধও কিনতে হয়ঃ তবে ওষুধের দাম বাইরের থেকে কিছু কমই পড়ে, কারণ হাসপাতাল ওষুধ কেনে গুজরাটের Low Cost Organisation-এর কাছ থেকে। Low Cost Organisation ওষুধ বিক্রি করে নামমাত্র লাভ রেখে। খুব প্রয়োজনে শ্রমিক সংঘের অন্যান্য একজন আছেন শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। কিন্তু তাতে চিকিৎসার কাজে কোন অসুবিধাই হয় না। স্বাস্থ্যকর্মীদের সকলেই ওখানকার ঠিকা শ্রমিক। কাজের শেষে বিকেল 3-4 টা থেকে 6-7 টা পর্যন্ত হাসপাতালে অথবা স্বাস্থ্য আন্দোলনের অন্যান্য কাজ করেন। প্রয়োজনে কাউকে কাউকে অনেক রাত অব্দিও থেকে যেতে হয়। হাসপাতালে একটি প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরীও রয়েছে। চিকিৎসার ব্যাপারটা এখানে শুধুমাত্র হাসপাতাল চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মহামারী, আন্দোলন ইত্যাদির সময়ও সকল স্বাস্থ্যকর্মী-ডাক্তার সহ হাসপাতালের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সকল কর্মীই দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলে গিয়ে ক্যাম্প করে চিকিৎসা, ওষুধ বিতরণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজ করে থাকেন। রোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন কাজকর্মও একইভাবে করা হয়।

স্বাস্থ্যকর্মীরা হাসপাতাল সংক্রান্ত কাজের জন্য কোন পারিশ্রমিক নেন না। ওখানকার ডাক্তার-সিস্টার সহ স্থায়ী কর্মীদের ঠিক মাহিনা নয় তবে অনারারিয়াম হিসাবে ডাক্তারদের 1000 টাকা, সিস্টার ও অন্যান্য স্টাফদের 300-350 টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। দৈনিক খাওয়া-দাওয়া ওখানকার মেস্ থেকে পাওয়ার ব্যবস্থা আছে, তবে কেউ কেউ বাড়ীতেই খান। ডাক্তারদের থাকার জন্য ঘরও আছে।

প্রতিদিনকার পরিচালন ব্যবস্থার সমস্ত কিছুই স্টাফ্-সিস্টার-ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মী সহ হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত সকল শ্রমিকই একত্রে মিলে করে। অনারারিয়ামের হার, ওষুধ সহ অন্যান্য খরচাপাতি, প্রশাসন সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্তই সকলে মিলে বসে গ্রহণ করে। প্রতি সপ্তাহান্তে একবার করে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসা হয়। কোন কর্মীর কাজে গাফিলতি জনিত শাস্তির সিদ্ধান্তও সকলে মিলে আলোচনার পর নিতে হয়। এসব ব্যাপারে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার এতটুকু সুযোগ নেই,—যেটা অন্যান্য অনেক স্বেচ্ছাসংগঠনের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে।

শহীদ হাসপাতাল এখন দল্লীরাজহরার জনপ্রিয় হাসপাতাল। কারণ এখানকার প্রতিটি কর্মীর আন্তরিকতা, কাজের প্রতি ভালবাসা কর্মনিপুনতা, রোগীদের প্রতি ব্যবহার শ্রদ্ধা জাগায়। ওখানকার Operation Theatre-এ এখন সিজার সহ বহু জটীল কাটা ছেঁড়া হয়ে থাকে সফলভাবেই। এসব ব্যাপারে ওখানকার সুনাম উত্তরোত্তর বাড়ছে। শহীদ হাসপাতালের উপস্থিতি সরকারী মহলেও বেশ ভক্তি ও ভীতির সৃষ্টি করেছে। তাই প্রতিযোগীতায় BSP এবং সরকারী হাসপাতালের দ্রুত সম্প্রসারণে বাধ্য হচ্ছে কর্তৃপক্ষ। ঐ অঞ্চলে সরকারী বহু উদ্যোগই শহীদ হাসপাতালের সাহায্য ছাড়া সম্ভব হচ্ছে না। চক্ষু শিবির, TB রোগীদের চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যাপারে সরকারের সাথে যৌথ উদ্যোগ নিয়েছে শহীদ হাসপাতাল। তবে একই সময়ে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর ব্যাপারে সরকারী স্কীমের বিরোধিতা করেছে ঐ হাসপাতালের সকলেই, যদিও সরকার থেকে টাকা পয়সা সহ বহু টোপের ব্যবস্থা ছিল ঐ একটা ক্ষেত্রেই সব থেকে বেশী।

শহীদ হাসপাতালের চিকিৎসক ডঃ আশিস কুন্ডুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম "এত কম সুযোগ সুবিধা,—তবু এখানে কাজ করছেন কেন? জানতে চেয়েছিলাম, কলকাতার নামকরা বড় বড় হাসপাতালের সাথে এর পার্থক্য কি?

তিনি বলেছিলেন,—"নামকরা সমস্ত হাসপাতালের থেকেই আমাদের হাসপাতাল অনেক অনেক ছোট। ছোট বিল্ডিং, ছোট ছোট সাধারণ সাধারণ যন্ত্রপাতি, অনেক কম ডিগ্রিধারী ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী। এখানকার প্রশাসন সকলের বোধগম্য, সহজ সরল, একেবারেই "গ্রাম্য",—তাই একে এত ভালবাসি, এর প্রতি টান"। তিনি বলেছিলেন, "এখানে কাজ করতে ভাল লাগে তার কারণ এখানকার কোন রুগীই বাইরের কোন শাঁসালো আগন্তুক নন— যাঁর কাছ থেকে ইচ্ছেমত Fees আদায় করা যায়, যাঁর উপর যে কোন রকম ওষুধ পরীক্ষা করা যায়। এখানকার প্রতিটি রুগীই আত্মীয়ের মতই,—কারণ প্রায় দু'বেলাই হাটে মাঠে এঁদের সাথে দেখা হয়, এঁদের দাওয়ায় বসে চা খাওয়া হয়, ব্যক্তিগত পারিবারিক নানা গল্প হয়। এখানে ডাক্তরা রুগীর সম্পর্ক,—আসলে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক। তাই চিকিৎসা করার ব্যাপারে অনেক বেশী মনোযোগী হ'তে হয়। এখানে চিকিৎসা করা ব্যাপারটাই অনেক চ্যালেঞ্জিং, অনেক ইন্টারেস্টিং। এখানে ওষুধ লিখতে হয় মেপে মেপে, ভেবেচিন্তে। যথেচ্ছ টনিক, ভিটামিন বা অন্য কোন নামীদামী অপ্রয়োজনীয় ওষুধ লেখা চলে না কোনভাবেই। এ হাসপাতালের রুগী আর তার বাইরের সত্তাটুকুও অঙ্গীভূত হয় ডাক্তারী মনের সাথে। প্রফেশনাল ডিস্স্যাটিসফেকশন্ অনেক কম, কারণ এখানে ডাক্তার-রুগী-প্রশাসন কারো সাথে কারোর সম্পর্কই যান্ত্রিক নয়, ব্যবসায়িক নয়।"

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি ভারতের কটা হাসপাতালের কথা জানেন যার প্রতিটি ইঁট তৈরী থেকে আরম্ভ ক'রে, ইঁট বহন করা, গাঁথা, হাসপাতালের যন্ত্রপাতির জন্য টাকা সংগ্রহ করা সব কিছুই করেছেন সেইসব অবহেলিত-শোষিত ঠিকা শ্রমিকরা যাঁরা বা যাঁদের আত্মীয়স্বজনরা বা যাঁদের পাশের গ্রামের মানুষ প্রয়োজনে ঐ হাসপাতালেই চিকিৎসিত হবেন। আপনি কটা হাসপাতালের কথা জানেন যার পরিচালন ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে ঐসব শ্রমিকরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আপনি কটা হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের দেখেছেন যাঁরা ঐ শ্রমিকদের মধ্য থেকেই এসেছেন,—যাঁরা হাসপাতালের চিকিৎসার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন সাহায্য করেন ঠিক তেমনি জনস্বাস্থ্যের নানা ব্যাপারেও উদ্যোগ নেন। এইভাবে যে একটা হাসপাতাল চলতে পারে তা হয়তো অনেকেরই অবিশ্বাস্যই মনে হবে।"

বিরূপ প্রচার, চক্রান্ত, নষ্টামি

নিজেদের উদ্যোগে, নিজেদের ক্ষমতায়, লোকাল রিসোর্সের উপর দাঁড়িয়ে অবহেলিত সংগঠিত ঠিকে শ্রমিক পরিচালিত হাসপাতাল দল্লীরাজহরার শ্রমিক শক্তির প্রাণকেন্দ্র, তাই সরকারী প্রশাসন, BSP-এর কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় "শক্তিশালী" রাজনৈতিক নেতারা একে ভয় করে। সে কারণেই বিরুদ্ধ প্রচারও হয় মাঝে মাঝে। যেহেতু শহীদ হাসপাতালের ডাক্তারদের সকলেই বাঙালী তাই ওখানে বাঙালী-বিদ্বেষী মনোভাব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। কোন কোন সময়ে "এসব নক্সালাইটরা করছে" ব'লে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টাও চলে। কেউ কেউ ভারত সরকারের কাছে ঐ হাসপাতালটির জাতীয়করণের জন্যও প্রস্তাব তুলেছিলেন বলে জানা গেছে।

জমির পাট্টা না থাকার অজুহাতে মধ্যপ্রদেশ সরকার বিদ্যুৎ দিতেও গড়িমসি করছেন। একই কারণে প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক থেকে ধারও মিলছে না, এক্সরে মেসিনের জন্য বা অন্য কোন দরকারে সরকারী সাহায্যও পাওয়া যায় না কোনভাবেই। এসব থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার এ হাসপাতাল সুস্থভাবে চলুক তা ওরা চায় না। তা ওদের পছন্দ নয়।

তবুও চলছে—চলবেও

বহু ধারদেনা, বহু রকমের অসুবিধা সত্ত্বেও এখনও শহীদ হাসপাতাল চলছে। এ হাসপাতালকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, এ ধরণের উদ্যোগকে বাঁচিয়ে রাখা, লালন করা, বিস্তার করা আজ বড় প্রয়োজন—এ উপলব্ধি আজ ওখানকার সকল সচেতন শ্রমিকের প্রতিটি রক্তবিন্দুতে। তাঁরা বুঝতে শিখেছেন স্বাস্থ্য প্রতিটি মানুষের অধিকার, তাই যে কোন মূল্যে তাকে আদায় করে নিতে ওঁরা অপ্রতিরোধ্য লড়াকু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, ঐ হাসপাতালকে ঘিরে জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে। □

পরমাণু সাম্রাজ্যের অন্দরমহল

পরমাণু শক্তি কমিশনের বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলির ভিতরকার আবহাওয়াটা ঠিক কিরকম তার স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় এস.আর. কৃষ্ণমূর্তি (SRK) বনাম রাজারামান্না ও ভারত সরকার মামলায়। ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে অবশ্য এ ধরনের ঘটনা বিরল নয়।

কৃষ্ণমূর্তি (সতীর্থদের কাছে SRK নামে পরিচিত) 'বার্ক'-এর (BARC) একজন কৃতী ও উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার। 1962 সালে তিনি পরমাণু শক্তি কমিশনে যোগ দেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি. ই. এবং ইলেকট্রিক্যাল মেশিন ডিজাইনে এম. এস. সি পাস করে ইন্ডাস্ট্রীতে কাজ করার কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তিনি। 1972 সালে অটোমেশনে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য তাঁকে ইংলন্ডে পাঠানোর আগে পর্যন্ত তাঁর কোন 'দোষ' পাওয়া যায় নি এবং তাঁকে দুটো প্রমোশনও দেওয়া হয়। বিলেতে কন্ট্রোল সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিংএ তিনি M. Tech পাস করেন এবং নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটর প্রবলেমে মডার্ন কন্ট্রোল থিওরি নিয়ে গবেষণা করেন। 1973 সালে দেশে ফিরে এলে তাঁকে ক্রমাগত এক ডিভিশন থেকে অন্য ডিভিশনে, এক গ্রুপ থেকে অন্য গ্রুপে, এমনকি এক সংস্থা থেকে অন্য সংস্থায়ও বদলি করা হতে থাকে। কিন্তু তাঁর স্পেশালাইজেশনের ক্ষেত্রে তাঁকে কোন কাজ দেওয়া হয় না। ছোটোখাটো কাজ তাঁকে দু-একটা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কর্তাব্যক্তিরা পরে সেই কাজে কোন আগ্রহ আর দেখান নি। কাজ করতে না পেরে কৃষ্ণমূর্তি ক্লান্ত হয়ে উপরওয়ালাদের কাছে ক্রমাগত আবেদন নিবেদন করতে থাকেন।

1974 সালে বার্ক-এর তদানীন্তন ডিরেক্টর রাজা রামান্নাকে এক লিখিত পত্রে SRK জানান:

"...যাকে রিঅ্যাক্টর কন্ট্রোলে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে, রিঅ্যাক্টর কন্ট্রোল ডিভিশনে তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাকে ইলেকট্রনিক্স ডিভিশনের শেডের এক কোণে ফেলে রাখা হয়েছে। 1973 সালে এটা আপনি দেখেছেন।...আমাকে কোনরকম কাজ করতে কখনোই উৎসাহিত করা হল না। বিলেতে থাকবার সময় যে ব্যক্তি সপ্তাহে 70 ঘন্টা কাজ করতো, এখন তাকে বাধ্য করা হচ্ছে আলস্যে কালযাপন করতে। এতে আমি যে কি পরিমাণ অপমান, অবদমন, উৎপীড়ন ও মনোবেদনায় আছি তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।..."

তাঁর কথাবার্তায় বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখায় স্থানীয় কিছু কর্তাব্যক্তিরা চটতে থাকেন। SRK'র ঠিক ওপরের অফিসাররা তাঁর সম্বন্ধে ভালো রিপোর্ট দিলেও, আরো উপরের অফিসাররা তাঁর 'গ্রেডিং' কমিয়ে দেন বারে বারে এবং এসবই SRK'র অজ্ঞাতেই হয়। যে প্রমোশন তাঁর 1971 সালে হওয়া উচিত ছিল, তা তাঁকে দেওয়া হয়নি। তাঁর জুনিয়ারদের প্রোমোশন দেওয়া হয়েছে। যখন তাঁকে তাঁর জুনিয়ার ও নিম্নপদের একজন অফিসারের অধীনে কাজ করতে দেওয়া হয় তখন তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁকে আবার বদলী করা হয়। 1978 সালে ডঃ দস্তিদার তাঁকে মাদ্রাজের কলপক্কমে বদলীর জন্য লেখেন। সরকারি আদেশও এসে যায়। কৃষ্ণমূর্তি তাঁর প্রতিবাদ ও আবেদনপত্র নিয়ে বম্বে থেকে দিল্লী পর্যন্ত, ছোটো থেকে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত বারবার ধর্না দিয়েছেন। অনেকে এড়িয়ে গেছেন, অনেকে সুবিচার করেন নি। অবশেষে তিনি বম্বে হাইকোর্টে আপীল করলেন। "বার্কোয়া" (অফিসারদের এ্যাসোসিয়েশন) অর্থ ও নৈতিক সমর্থন নিয়ে কৃষ্ণমূর্তির পাশে দাঁড়ালেন। কিন্তু প্রবল কুটকৌশলী প্রতিপক্ষ যারা আদালতকেও প্রতারণা করতে দ্বিধা করে না, তাদের সাথে কৃষ্ণমূর্তি পারলেন না। কৃষ্ণমূর্তি সুপ্রীম কোর্টে আপীল করলেন। সুপ্রীম কোর্টের উপদেশে কৃষ্ণমূর্তি পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান রাজা রামান্নার কাছে আবার আবেদন করলেন (9. 9. '83)। তিনি লিখলেন:

"আমাকে এবার মাদ্রাজের RRC (Reactor Reserch Centre) -তে বদলী করা হচ্ছে। আমি অবিবাহিত। আমার মা 85 বছরের অসুস্থ বৃদ্ধা। আমি ছাড়া তাঁকে দেখাশোনা করবার আর কেউ নেই। মাদ্রাজের সাথে আমার কোন সংযোগ এখন আর নেই। সেখানে আমার মায়ের যাওয়া ও থাকা সম্ভব নয়। অনুগ্রহ করে আমাকে বম্বেতে থাকতে দিন।...আবারও আপনাকে জানাই যে প্রোমোশনের ব্যাপারে আমার উপর অবিচার করা হয়েছে। কনফিডেনশিয়াল রিপোর্টে আমাকে অত্যন্ত অসঙ্গতভাবে ছোটো করা হয়েছে।...1978 সালে ডঃ দস্তিদার আমাকে বম্বে থেকে বদলীর সুপারিশ করেন, কারণ আমি আমার "স্পেশালাইজেশনের ফিল্ডে" কাজ চেয়েছিলাম, প্রোমোশন দেবার দাবী জানিয়েছিলাম।...গত কয়েকমাস আমি বেতন পাই নি।..."

চেয়ারম্যান কোন জবাব দেন নি। এই রকম অবস্থায় 31. 12. 83 থেকে কর্তৃপক্ষ কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে আদেশ দিলেন। ঐ সময়ে কর্তৃপক্ষ আবার তাঁকে চার্জশীট দিলেন।...সুপ্রীম কোর্টে তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হল। কৃষ্ণমূর্তি স্বেচ্ছা-অবসর চাইলেন। কোন কারণ না দেখিয়ে ডিপার্টমেন্ট তা অগ্রাহ্য করল। বাড়ীতে থাকবার জন্যে বম্বের ভাড়ার রেট অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছ থেকে 20,000 টাকা দাবী করলেন। কৃষ্ণমূর্তি তাঁর প্রভিডেন্ড ফান্ডের 1 লাখ টাকা তুলতে চাইলেন যাতে বম্বেতে বিকল্প বাসা করা যায়। কর্তৃপক্ষ না দিলেন টাকা, না দিলেন কোন জবাব।

স্পষ্টতই কৃষ্ণমূর্তিকে যে কর্তৃপক্ষ একটা দৃষ্টান্তমূলক সাজা দেবেন তার পরিকল্পনা ভালোভাবেই করা হয়েছিল। আদালতে সাক্ষ্যদান-কালে রাজা রামান্না ও তাঁর সহযোগীরা 19. 8. 82 তারিখে এক অ্যাফিড্যাভিটে বলেন যে কৃষ্ণমূর্তির মত লোকেরা নিজেদের নানাবিধ গাফিলতি ও দোষ ঢাকবার জন্য অবিচারের ধুয়ো তোলেন, অপরের

বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এঁরা সিনিয়র অফিসার, বিভিন্ন গ্রুপের নেতৃত্ব এঁরা দেবেন, এটাই প্রত্যাশিত।....এই অবস্থায় তাঁরা যদি কাজ করতে না পারেন, এটা তাঁদেরই ব্যর্থতা, অন্য কোন বিভাগ ও গ্রুপের ডাইরেক্টরের দোষ নয়।

এ বক্তব্য শুনেই অফিসার্স এ্যাসোসিয়েশন তদানীন্তন শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের কাছে নিম্নলিখিত 5টি বিষয় পরিষ্কার করে বলার জন্য অনুরোধ রাখেন ঃ

1. বার্ক-এর অফিসাররা কি নিজেরাই কাজ তৈরি করবেন ?

2. কে বিচার করবেন কাজটি করার উপযুক্ত কিনা, সুযোগ-সুবিধা, টাকা-পয়সা ও জিনিসপত্র কেমন করে আসবে ?

3. নিজের নিজের স্পেশালাইজেশন ফিল্ডেই কি কাজ দেওয়া উচিত না ?

4. বিজ্ঞানী / ইঞ্জিনিয়ারদের বদলীর নিয়মনীতিগুলো কি ?

5. কিভাবে বিজ্ঞানকর্মীদের কর্মক্ষেত্র ঠিক করা হবে, কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বিলিব্যবস্থা কেমন করে হবে, কাজের মূল্যায়নই বা কেমন করে হবে ?

কোন উত্তর মেলেনি।

SRK-র ওপর অন্যায় উৎপীড়নের শেষ কোথায় হবে আমরা জানি না। তবে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, সময়ের সাথে ক্রমশ স্ফীত হবে পরমাণু শক্তি বিভাগের ক্ষমতার ইমারত।

এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক খবর ঃ SRK-র ওপর নিগ্রহের বিশদ তথ্য প্রকাশ করেছিল বার্কোয়া তাদের নিয়মিত বুলেটিনের একটি সংখ্যায়— উপর থেকে বার্কোয়াকে বাধ্য করা হয়েছে সংখ্যাটিকে প্রত্যাহার করতে।

বিশেষ প্রতিবেদক

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি

"পরমাণু বোমা কোন জবাব হতে পারে না"

নিচের বিবৃতিটি কিছু উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিজীবীর—প্রকাশিত হয়েছিল পয়লা মে 1981 তারিখে। এটির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য আজও অক্ষুন্ন রয়েছে বলে আমরা অনুবাদ করে পুনঃপ্রচারিত করছি। সঃ মঃ।

ভারত ও পাকিস্তানের আসন্ন পরমাণু বিস্ফোরণের সংবাদে আমরা গভীর উদ্বেগ ও আতঙ্ক বোধ করছি। ভারতীয় উপমহাদেশের সীমান্তে বর্তমানে দুটি বৃহৎ শক্তি একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়ানোর ফলে এক ভয়ংকর সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি বিষম প্রতিকূলতার মধ্যে বাঁচবার জন্য মরীয়া সংগ্রাম করছে। এই রকম এক অবস্থার মধ্যে পরমাণু বোমা বানানোর সপক্ষে সংকীর্ণ উন্মাদনা সৃষ্টির প্রয়াস স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি ও বৃহৎ অস্ত্র ব্যবসায়ী ছাড়া আর কারোরই মঙ্গল করবে না। সেই জন্য আমরা সংযম ও সতর্কতার আহ্বান জানাচ্ছি।

ভারত তার বিশেষ ভূরাজনীতিক অবস্থানের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার জাতিগুলির সামাজিক ও রাজনৈতিক দিশা অনেকটাই প্রভাবিত করতে পারে এবং করেও থাকে। সেইজন্য পরমাণু অস্ত্রসজ্জার দিকে যাওয়া-না-যাওয়ার সামগ্রিক গতি নির্দ্ধারণে ভারতের এক বিশেষ দায়িত্ব আছে বলে আমরা মনে করি। বেপরোয়া কোনো ডিক্টেটরের ভয়ংকর অত্যুন্নত কোন মারণাস্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে শানানোর সম্ভাবনা সবসময়েই আছে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানকে দেওয়া যে কোনো রকম অস্ত্রসজ্জারই আমরা বিরোধী। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান দখল করে পাকিস্তানের একেবারে সীমানায় এসে যে দাঁড়িয়েছে এ বাস্তব সত্যও বোধহয় আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। এই অবস্থায় পাকিস্তান আবার ভারতের বিরুদ্ধে আর একটা "ফ্রন্ট" খুলবে একথা ভাবাও কঠিন। সুতরাং "ভারতের নিরাপত্তার স্বার্থে" ইত্যাদি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্যই হল পারমাণবিক অস্ত্র প্রকল্পের পক্ষে জনমত গঠন করা। আমাদের দেশে একশ্রেণীর রাজনীতিক এ কাজ বহুদিন ধরেই করে আসছেন। কিন্তু এই রকম চরম সিদ্ধান্ত নেবার আগে উত্তর গোলার্ধে তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তা আমাদের জাতির ভালো করে ভেবে দেখা প্রয়োজন। পরমাণু বোমার জন্য আমাদের সামান্য সম্পদ পরমাণু ও মহাকাশের সামরিক প্রকল্প গুলিতে ঢালতে হবে। রাজনীতিক কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠীদের সাথে যোগসাজসে বড় বড় সমরশিল্প গোষ্ঠীগুলি প্রচুর টাকার 'অর্ডার' সংগ্রহ করবে। শীঘ্রই পরমাণু বোমাকে দেশের মর্যাদার সাথে এক করে দেখা হবে, এবং এক বিশেষ ধরনের শিল্পোন্নয়ন এবং পরমাণু অস্ত্রকে দেশপ্রেমের আলোয় দেখা হবে। পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতা থেকে সরে এসে উন্নয়নের ভিন্নপথে চলা তখন প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে। "সল্ট" (SALT) চুক্তির সেটাই শিক্ষা। সেখানে কোন বৃহৎ শক্তিই তার সামরিক শিল্প অগ্রগতি থেকে পিছিয়ে আসতে ইচ্ছুক নয়। প্রতিযোগিতা একবার শুরু হয়ে গেলে তখন তা আপন গতিতে চলতে থাকে। মানব সমাজের ভাগ্য তখন পরমাণু বোমার উপর দাঁড়িয়ে থাকে। সুতরাং সময় আছে, এবং

ঠাণ্ডা লড়াই এর খেলায় শিকার না হবার সুযোগ নয়াদিল্লীর এখনো আছে।

পাকিস্তানের সাথে আমাদের প্রকৃত লড়াই অস্ত্র ও বোমার নয়। এ লড়াই হল দুই পথের দুই আদর্শের ধর্মান্ধ অনগ্রসরতার সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার। আমরা পাকিস্তানের রাজনীতি ও রাজনৈতিক কাঠামোর বিরোধী, যদিও কোনো অবস্থাতেই পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরোধী আমরা নই; কারণ তারা আমাদের মত একই ভাষা ও একই সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। এই অঞ্চলের দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপরতাই আমাদের প্রকৃত শত্রু, কোনো অঞ্চলের মানুষ নয়। যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ খেতে পায় না, যেখানে বহু স্থানে সামান্য পানীয় জল পাওয়াও দুষ্কর, সেখানে পরমাণু বোমার কথা বলা নিছক উন্মত্ততা এবং জঙ্গীপনা ছাড়া আর কিছু নয়।

ভারত হল দক্ষিণ এশিয়ার "সুপার পাওয়ার"; পাকিস্তানের ভয়ে তাকে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে বাধ্য হতে হচ্ছে, এমন কথা বলা বাতুলতা মাত্র। দুর্ভাগ্যপ্রপীড়িত এই উপমহাদেশের ইতিহাস আমরা কোন পথে চালানোর দায়িত্ব নেব? দক্ষিণ এশিয়ায় দেশসমূহের ভাগ্যেতিহাস নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নেওয়া থেকে আমরা কিভাবে অব্যাহতি নিতে পারি?

আমাদের দেশের জনসাধারণের দুই তৃতীয়াংশ বেকার বা অনুপযুক্ত কর্মসংস্থানে আছে। আমাদের শিল্পগুলিতে প্রায়ই বিদ্যুতের অভাব, অভাব কাঁচামালের, হঠকারি কোনো সিদ্ধান্তে আরও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রাদি থেকে সম্পদ পরমাণু বোমা প্রকল্পে চালান করতে হবে। তাহলে আমাদের সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজকর্ম সমূহ অর্থাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে শিল্পোন্নয়ন। কোটি কোটি ভারতবাসীর জীবনের দৈনন্দিন মৌলিক প্রয়োজন মেটানো, আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভালভাবে চালানোর চেয়ে কয়েকটি বড় বড় বোমা ফাটিয়ে চমক লাগানো অনেক সহজ। দারিদ্র্য দূর করার (গরিবী হঠানো) প্রতিশ্রুতিতে ব্যর্থ হয়ে সরকার পরমাণু চমক লাগিয়ে জনগণকে মোহগ্রস্ত করে ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকতে চাইছেন।

ন্যায়বিচার ও ক্ষমতার ভিত্তিতে সমাজগড়ার লক্ষ্য থেকে পরমাণু উন্মত্ততা ('নিউক্লীয়ার হিস্টিরিয়া') আমাদের দূরে নিয়ে যাবে। সমরতৎপরতা ও পরমাণু প্রতিযোগিতা আমাদের বৈদেশিক নির্ভরতা আরও বাড়িয়ে দেবে। এবং বিশ্বের অস্ত্র ব্যবসায়ীরা সুকৌশলে আমাদের এই অঞ্চলে এক দেশকে অন্য দেশের বিরুদ্ধে উস্কে দেবে। ঠান্ডা লড়াইয়ের পরিবেশ জীইয়ে রাখতে পারলেই তারা তাদের আর্থিক মন্দা থেকে বাঁচতে পারে, শান্তি তারা ভয় করে।

ভারতীয় উপমহাদেশের মঙ্গলের জন্য আমরা ভারত সরকারকে অনুরোধ করছি পাকিস্তানের সাথে আলোচনায় আবারও বসতে। দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিচার করে প্রতিরক্ষার সমস্যার সমাধানের পথ খোঁজা উচিত যাতে আজ হোক কাল হোক পাকিস্তান ও ভারত অঞ্চলের সামগ্রিক স্বার্থে এক সাথে কাজ করতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি সমস্যা সমাধানের কুটনৈতিক পথ অবশ্যই আমাদের সামনে খোলা আছে। কিন্তু পরমাণু বোমা নিশ্চয়ই কোন জবাব হতে পারে না।

আকীল আহমেদ (অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ অব ইন্ডিয়া, হায়দ্রাবাদ)

স্বামী অগ্নিভেদ (রাজনৈতিক কর্মী)

আন্দ্রে বেটেইল (সমাজবিজ্ঞানী, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়)

শ্রী দেবদত্ত (লেখক)

শ্রী কমলেশ (লেখক)

করুণাকর গুপ্ত (চীন বিশেষজ্ঞ)

বি. এম. কৌশিক (ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিস)

হরিশ খাড়ে (সহকারি সম্পাদক, হিন্দুস্তান টাইমস্)

টি. এন. মদন (ইনস্টিটিউট ফর ইকনোমিক গ্রোথ)

গোবিন্দ মুখোটি (পিপল্‌স ইউনিয়ন ফর ডেমোক্র্যাটিক রাইটস্)

আশিস নন্দী (সেন্টার ফর দি স্টাডি অব ডেভেলপিং সোসাইটিজ)

এন. এ. পালকীওয়ালা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত)

শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত (রাষ্ট্র সংঘের সাধারণ পরিষদের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট)

ধীরেন্দ্র শর্মা (জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়; পরমাণু বিরোধী আন্দোলন সংগঠক)

সোলি জে সোরাবজী (সিনিয়ার অ্যাডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট)

জাস্টিস ভি. এম. তারকুন্ডে (পিপলস্ ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ)

বি. জি. ভার্গিস (সাংবাদিক)

এবং আরও অনেকে।

অর্ধেক আকাশের নক্ষত্রেরা (তিন)

স্বরূপ গুপ্ত

নারী-পুরুষের সামাজিক বৈষম্যের কোন জীববৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই—একথা ব্যাখ্যা করে (বি-ও-বি, নভেঃ-ডিসেঃ 1986 ও জানু-ফেব্রু 1987 দ্রঃ) নীপার জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয় অনিমেষ : কেন এই পণ-মৃত্যুর মিছিল? আলোচনা ছুঁয়ে যায় অনেক প্রসঙ্গ—শিশু মানসিকতার উপাদান থেকে নারী-মুক্তি আন্দোলন। কিন্তু নীপার প্রশ্নের উত্তর মিলল কি ?

অনিমেষ জামা কাপড় পরে বেরোচ্ছিল। হঠাৎই বিজন আর নীপা এসে উপস্থিত। বিজন বলল—যাঃ তুই বেরোচ্ছিস, আমরা ভেবেছিলাম আজ ছুটির দিন, এসময়ে তোকে পেয়ে যাব। নীপার ভারী ইচ্ছে ও তোর মেসটা দেখে।

বিছানাটার উপর থেকে এলোমেলো জামা কাপড় বই ইত্যাদি সরিয়ে ওদের বসবার জায়গা করে দিতে দিতে অনিমেষ বলে—এসে পড়ে ভালই করেছিস, তেমন কাজ ছিল না, কিন্তু আর একটু দেরী হ'লেই হয়েছিল আর কি....

নীপা বিছানায় বসে পড়ে বলে—কোন ভনিতা না করেই বলি, আজ কিন্তু আমার প্রশ্নটার উত্তর চাই-ই। শুধুমাত্র দিল্লীতেই নাকি এখন গড়ে দুটো কোরে বধূ হত্যার ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন,—কাগুজে পরিভাষায় ডাউরি-ডেথ। তোমার তত্ত্বকথা আমাকে এই বাস্তব সমস্যাটা বুঝতে সাহায্য করবে কি ?

অনিমেষ নীপাকে থামায়—দাঁড়াও দাঁড়াও,অত অধৈর্য হয়ো না। তোমার প্রশ্নের উত্তর, সত্যি বলতে কি, আমার জানা নেই। তবে আলোচনা করাই যেতে পারে।... প্রসঙ্গে আসার আগে গত দুদিনে বলা কথার রেশ ধরে আরও কয়েকটা কথা বলা দরকার।....

বিবর্তনের পথে, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব কবে ঘটেছে তা নিয়ে বিতর্ক আজও শেষ হয়নি। তবে সর্বাধুনিক মতটা হল প্রাচীন বানর গোষ্ঠী থেকে মানুষ বা শিম্পাঞ্জী বা গরিলার পৃথক হবার প্রক্রিয়াটা শুরু হয় অনধিক পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে। আবার শিম্পাঞ্জী ও মানুষের প্রোটিন অণুর গঠন-বিন্যাসের তুলনায় শতকরা মাত্র এক ভাগ অমিল দেখা গেছে। অতএব বলা যায়, যে এই অমিলটুকু গড়ে উঠতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বছর লেগেছে। অথচ মাত্র পঞ্চাশ হাজার বছরেই মানুষ হয়ে উঠেছে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, বিশিষ্ট জীব। সমাজ সংগঠনের মধ্যে নানাবিধ চর্চাই মানুষের বিবর্তনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে এবং শিম্পাঞ্জী-গোরিলার সঙ্গে মানুষের আজকের বাস্তব পার্থক্য সম্ভব করে তুলেছে। জেনেটিক নয় "সোশিও জেনেটিক" বিবর্তনের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে ব্যাখ্যা করেছেন কেউ কেউ। আজ পর্যন্ত ভিন্নতর কোন মনুষ্য প্রজাতির উদ্ভব ঘটেনি, যদিও মানুষ কৃত্রিম প্রভাব খাটিয়ে ভিন্নতর পশুপাখী ও প্রজাতি সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। এসব থেকে, মোটের উপর একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে নবজাত প্রতিটি মানবশিশুরই স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, জিনগত দিক থেকে বিকশিত হবার সম্ভাবনা সমান। পার্থক্য যা ঘটে তা শরীর সংস্থানগত, স্নায়বিক ও সামাজিক কারণের মধ্যে নিহিত। এবং এক্ষেত্রে এটাও বিবেচনা করে দেখতে হবে যে নারী পুরুষের মানসিকতা ভিন্নপথে গড়ে ওঠার সুযোগ থাকছে কিনা, থাকলে তা কিভাবে, কতটা ?

এবার নীপা, তোমার তোলা প্রসঙ্গে চলে আসা যাক। প্রথমে অবশ্য একটা সীমারেখা স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন। আজকাল আমরা যেসব নারীদের পণ-মৃত্যুর কথা কাগজে পড়ছি, মামলা-টামলাও হচ্ছে, তাদের অধিকাংশই মূলত শহুরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ঘরের, এটা মানছ তো ?

বিজন মন্তব্য করে—দরিদ্রদের মধ্যে এবং গ্রামাঞ্চলেও বিষ খাওয়া, গলায় দড়ি দেওয়া বা আগুনে পুড়ে নারী মৃত্যুর ঘটনা কম নয়। এঁরা শহুরে মধ্যবিত্ত নন, কাজেই কাগজে জায়গা হয়তো তেমন হয় না...

নীপাও প্রতিবাদের সুরে যোগ করে—শুধুমাত্র শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের আলাদা কোরে দেখবো কেন ? সব মেয়েদেরই একটা মোটামুটি কমন জায়গা তো আছে ?

অনিমেষ—অবশ্যই আছে এবং সেটা প্রধানত শারীরবৃত্তীয়। কিন্তু মেয়েরাও অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগের বাইরে নন এবং সামাজিক বিভেদের জায়গাটাকে ধরতে হলে আর্থিক ভাবে মোটামুটি সচ্ছল অংশ থেকেই অনুসন্ধান করা উচিত। আর্থিক অনটন অন্য সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে দেয়। একথাও স্বীকার করব যে আমার চেনা জানার পরিধিও শহুরে বা শহর ঘেঁষা মধ্যবিত্তদের ঘিরেই। প্রামাণ্য সমীক্ষা-টমীক্ষারও বড় অভাব।...এখন তুমিই বলোতো নীপা, কিভাবে কোন পরিস্থিতিতে মোটামুটি শিক্ষিত সচ্ছল পরিবারে বৌ হয়ে আসা একটি মেয়ে আত্মহত্যা করে বসে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাকে হয়তো খুনই করা হয় ?

নীপা বলে—এ তো সবারই জানা—প্রথমত পণ-যৌতুকের জন্য চাপ-লাঞ্ছনা ; দ্বিতীয়ত, মানুষ হিসেবে কোন স্বীকৃতি না দেওয়া, মতামত উপেক্ষা বা অবহেলা করা ; বাপ-মা ভাই-বোন আত্মীয়-বন্ধুদেরও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা; বংশ বা পরিবারের প্রতি কটাক্ষ ; তার সঙ্গে হয়তো যোগ হয় দৈনন্দিন জীবনে খুঁটিনাটি দোষ-ত্রুটি উপলক্ষ্য করে উপহাস-বিদ্রূপ, অপমান-ঘৃণা এমনকি শারীরিক নির্যাতন এবং হয়তো খেতে পর্যন্ত ঠিকমত না দেওয়া। নিজস্ব কোন সংস্থানের অভাবে এবং বিশেষত বাপের বাড়ী যদি হয় গরীব ও প্রভাবহীন তবে মেয়েটির আর কোন উপায়ই থাকে না।...

দুম করে বিজন বলে—একটা ব্যাখ্যা শোনা যায়—সাইকোলজিক্যালি আত্মহত্যাটা হ'ল আত্মনিপীড়নের মানসিকতা, কিন্তু....হ্যাঁ, আরও

আরও ব্যাখ্যাও শোনা যায়—অনিমেষ থামিয়ে দিতে চায় বিজনকে—মানসিকতাটা কোথাও কোথাও প্রতিহিংসার, কোথাও বা গভীর শূন্যতা-বোধ, জীবন সম্পর্কে চরম বিতৃষ্ণা....নীপা বুঝি রেগেই যায়—তোমরা এবার টিপিক্যাল পুরুষদের মত কথা বলতে শুরু করেছ।

—দুঃখিত নীপা, আমাকে তুমি শেষ করতেই দিলনা। আমি কিন্তু বলিনি যে এগুলো বেদনাদায়ক এমনকি বর্বরোচিত নয়। আমার মনে হয় শেষ বিচারে চরম অসহায়তা বোধ থেকেই আসে বিপত্তি।—উত্তেজনা অনিমেষকেও বুঝি আক্রমণ করে—আচ্ছা নীপা, কোন পুরুষ যদি নিজের পরিচিত পরিবেশ, আত্মীয়-বন্ধু ছেড়ে স্ত্রীর পরিবেশ পরিজনের মধ্যে যায় তবে তার ক্ষেত্রে তুমি যা বললে তা যে ঘটবে না, একথা কি তুমি বলতে পারো? একটু টেনে টেনে নীপা উত্তর দেয়—ঘটবে নাই একথা বলা হয়তো যায় না, কিন্তু সম্ভাবনা কম। তাছাড়া সেরকম আর কটা ঘটে? অনিমেষ—দেয়ার ইউ আর; ততখানি জোর দিয়ে বলতে পারছো না। এরকম কেস যত কমই হোক, উল্টো ক্ষেত্রে অনেক পুরুষকেও ভুগতে হয় এসব তথাকথিত আত্মনিপীড়ন বা প্রতিহিংসা বা শূন্যতাবোধের মানসিকতায়।

কয়েক মুহূর্ত তিনজনই চুপচাপ। অনিমেষই আবার শুরু করে—আমি মনে করি সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের বাই-প্রোডাক্ট এগুলো। ...তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ আমাদের চারপাশের নারীরা জন্ম থেকেই কি ধরনের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। চারপাশে নিষেধের বেড়াজাল, দৃষ্টি ও বোধশক্তি আচ্ছন্ন করার কত না শিক্ষা। ...ওদের সঙ্গে মিশিস না, ওরা নোংরা, ছোটলোক; বাইরে বেরোস না রোদ লাগবে, ঠান্ডা লাগবে। ...নরম মনেই দাগ কাটে—খোলা প্রকৃতির মধ্যে কখনও যেতে নেই, অনুমোদিত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছাড়া মিশতে নেই। নিজেকে নিজে প্রতিমুহূর্তে আবিষ্কার করার মধ্য দিয়ে আসে যে আনন্দ, আত্মবিশ্বাস সম্পূর্ণতা তা আমাদের শিশুকন্যাদের মধ্যে কিছুতেই স্ফুরণ হবার সুযোগ পায় না। আমি এমন পরিবার বহু দেখেছি, যেখানে, মা তার আট দশ বছরের মেয়েকে তারই প্রায় সমবয়সী একটি মেয়ের কাজের তদারকি করতে বলছে—বড্ড ফাঁকিবাজ, দেখিস, হাতটান খুব, লক্ষ্য রাখিস, এসব ছোট লোকদের একবার মাথায় তুললে কোন কাজ পাওয়া যায় না, ইত্যাদি। কথায় কথায় কাজের মেয়েটির দোষত্রুটির আচরণের ব্যাখ্যা হয়—রক্তের দোষ যাবে কোথায়। এ ভাবেই শিশু ভাবতে অভ্যস্ত হয় নিতান্ত কাছের গুটিকয় মানুষ ছাড়া আর সব মানুষই হয় ঝি-চাকর, নয় ছোটলোক, চোর, ছেলেধরা বা ঐরকম কুমতলবপূর্ণ জীব। ...মেয়েদের জনপ্রিয় ম্যাগাজিনগুলো খুলে দেখো কিসের চর্চা—শাড়ী, গয়না, প্রসাধনী, নিরালম্ব রোমান্টিক ভাবালুতা এবং কেচ্ছা, আধুনিক প্রগতিশীলতাও সামিল তাতে। এই তো কদিন আগেই পড়ছিলাম নতুন এক মেয়েদের পত্রিকায়, এক মহিলা সগর্বে বলছেন—'আমরা বিশ শতকের নারী, চারদিকে সমমনস্ক পুরুষ কই যে তাল রেখে চলবে?' এমন এক রঙীন কল্পনার জগতে এঁরা ভাসমান যে বাস্তবের সব কিছুই এঁদের কাছে অসহ্য নোংরা ঠেকে...

—তথ্য ছাড়াই তুমি এমন সব জেনারেল মন্তব্য করতে পারো না—নীপারও দৃঢ় মত—তাছাড়া চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে মহৎ এমন দাবিকেউ করে নি...

অনিমেষ বলে—তথ্যের ঘাটতির কথা তো আমি আগেই বলেছি। তবে, নীপা, পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের উচ্চমন্যতার দাবীও কেউ কেউ করছেন বই কি! একটু আগে ঐ ভদ্রমহিলার উক্তিতে দেখেছি তারই বহিঃপ্রকাশ। দাঁড়াও, আরও একটা প্রমাণ দেখাই। টেবিলের বই হাতড়ে আরও একটা ঝকমকে মেয়েদের পত্রিকা বের করে অনিমেষ। অত্যন্ত জনপ্রিয় এক লেখকের স্ত্রীর ছবি সহ বক্তব্য ছাপা হয়েছে চোখে পড়া রঙীন বক্সের মধ্যে। জায়গাটা দেখিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে থাকে—"নারী পুরুষের চেয়ে উন্নত প্রজাতির জীব। বুদ্ধি করে পুরুষকে জয় করতে হবে। মেয়েদের পুরুষকে জয় করার ক্ষেত্রে একটা শারিরীক সুবিধা আছে। এই সুবিধাটাকে কাজে লাগাতে হবে। সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে হবে। পুরুষরা যেমন অনেক সময় মেয়েদের ব্যবহার করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, মেয়েদেরকেও প্রয়োজন মত সেটা করতে শিখতে হবে।" পত্রিকাটা সরিয়ে রেখে অনিমেষ বলে চলে—এদেশের সাধারণ শিক্ষাই হ'ল যে মেয়েরা পুরুষদের বশ্যতা স্বীকার করবে, নির্ভরশীলা হবে। এত' একটা ভুল শিক্ষা। নিজের মনোভাব গোপন করে প্রতিনিয়ত নির্ভরশীল তথা বশংবদ হতে কোন মানুষই পারে না—এক সময় তা জন্ম দেয় অবদমনের ক্ষোভ, সুযোগ পেলেই আত্মপ্রকাশ করে স্বৈরাচারিতারূপে। এই ভ্রান্তি দূর করা দরকার ঠিকই, কিন্তু তার জন্য পুরুষদের তুলনায় নারীর উচ্চমন্যতার যুক্তি দেখানোটা একই অচল মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখানো। ভদ্রমহিলার উক্তিতে কি সেটা স্পষ্ট নয়? থাকগে, যেকথা বলছিলাম...ছোটবেলায় বাপ-মা'র আগ্রাসী স্নেহ-মমতা, একটু বড় হ'লে চারপাশ থেকে আসা এইসব উপকরণ, কোথায় নিয়ে যায় আমাদের? অনুদাসীনতাও শিখতে হয়, আলোচনা করতে, নিজের ভুল বুঝতেও শিখতে হয়। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস আসে মেলামেশার মধ্য দিয়ে, কার্যকরী সামাজিক শ্রমের মধ্য দিয়ে। অনেক বাবা-মা'ই সন্তানের জন্য যে উত্তরাধিকার রেখে যান তা শ্রমহীনতার, অথচ শ্রমশীলতাই শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার, বলেন অনেক মনীষী।

আত্মমগ্নভাবে বলেই চলে অনিমেষ এহেন অবস্থায় কোথা থেকে কেমন করে আসবে বিচারবুদ্ধি, সাহস, সহিষ্ণুতা, সংগ্রামী মনোভাব? চারপাশের মানুষজনের চিচিত্র জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে এঁরা যদি কোনরকম উদার আগ্রহ দেখাতে না পারেন, যদি নারী হয়েও অপরাপর নারীদের আর্তনাদ তাঁদের কানে না পৌঁছয়, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? ....কালের নিয়মে এঁরা বড় হন, জীবন নিয়ে আসে ক্রমশ বড় বড় দায়িত্ব ও দুঃখ-কষ্টের বোঝা। এইসব অতিনির্ভরশীলা কন্যারা অনেকেই

নতুন সংসারে পা দেন সঙ্গে নিয়ে একটা ভীতি বা সন্দেহের বাতাবরণ, ক্রমশঃ তার ছাপ পড়ে আশেপাশের মানুষজনের মধ্যেও, কল্পনা বাস্তবায়িত হয়। বধূও আক্রান্তা হন পারসিকিউশন ম্যানিয়া দ্বারা চারপাশের সকলেই সর্বদা তাকে অপমান অপদস্থ লাঞ্ছনা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বুঝিবা! এর সঙ্গে যদি যুক্ত হয় সম্পত্তি বা পণ-যৌতুকের ব্যাপার, তাহ'লে তো সোনায় সোহাগা! শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের পরামর্শ অতএব অবাঞ্ছিত উপদ্রব। বাইরের কাউকেও তো বলা যাবে না এ সব ব্যক্তিগত বা সাংসারিক কথা, নেওয়া যাবে না কারও পরামর্শ! এ তাঁর একান্ত নিজেরই দুর্ভাগ্য এবং কাছের কয়েকটি মানুষই এর জন্য দায়ী! নিজস্ব মানসিকতার ক্ষুদ্র গন্ডিতে এক জটিল আবর্তে অভিমানিনী নারীর অসহায়তা ফুলে ফেঁপে ওঠে।...

বিজন বাধা দেয়—কিন্তু অনিমেষ, এসব পরিবারে শুধু মেয়েদের কেন ছেলেদের ও তো একই রকম ট্রেনিং হয়, এ তো একটা শ্রেণীচরিত্র।....

—হ্যাঁ, ছেলেদেরও একই রকম ট্রেনিং হয় বৈকি। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে, অধিকাংশ মেয়ের মেলামেশার, খোলামেলা আচরণের জগৎ ক্রমশ ছোট হয়ে আসে। ফলে ছেলেবেলায় গড়ে ওঠা মানসিকতার কোন পরিবর্তন বা প্রসার ঘটা খুব শক্ত, এমনকি তথাকথিত উচ্চশিক্ষার প্রভাবেও। আমাদের দেশে মেয়েরা ক্লাবটাবেও নেই। ছেলেমেয়েদের একসাথে নানারকম খেলাধুলো বা কাজকর্মে অংশগ্রহণ তো অকল্পনীয়। ....কি তুমি আর কথা বলছ না যে? —নীপাকে সচকিত করে অনিমেষ।

—কি আর বলবো—নীপা যেন একটু হতাশ, আস্তে আস্তে বলে—একটা আপাত নিরপেক্ষতার আড়ালে তুমি যেন মেয়েদের একহাত নিচ্ছ। তোমার অনেক মন্তব্যই অদ্ভুত, ভিত্তিহীন। যেমন, একটু আগে তুমি বললে—মেয়েদের আর্তনাদ মেয়েদের কানে পৌঁছয় না, বললে মেয়েরা নাকি অলস। হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে ওঠে নীপা—এ তোমার নিতান্ত অজ্ঞতা-প্রসূত মন্তব্য। ঘরের কাজের পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে তোমার ধারণা থাকলে এমন কথা বলতে পারতে না। তার উপর বাচ্চাকাচ্চা থাকলে যে ঝক্কি মেয়েদেরই সামলাতে হয় তারও তোমরা পুরুষরা কোন পরিমাপ করতে পারবে না! ঠান্ডা গলায় অনিমেষ উত্তর দেয়—আমি কিছু কিছু মহিলার কিছু কিছু ত্রুটির উৎস খোঁজার চেষ্টা করছি মাত্র; কিন্তু তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করতে চাইনি, নিশ্চয়ই সেটা আমারই বলার ত্রুটি। তাছাড়া, পুরুষদের আমি প্রশংসা করিনি মোটেই। সামাজিক ভাবে, মোটের উপর, নারীদের উপর নির্যাতনই যে প্রধান, তা আমি একদমই অস্বীকার করছি না। কিন্তু, আমার প্রশ্ন, এর মধ্যেও যে সব ক্ষেত্রে মেয়েরা তুলনামূলক ভাবে অনেক অনেক সুবিধাজনক অবস্থানে আছেন, সেখানেও কেন সংকট ঘনিয়ে ওঠে? দ্বিতীয়ত, পুরুষরা তো বটেই বহুসংখ্যক নারীও নারীদের দুঃখ-যন্ত্রণায় উদাসীন। তুমি কি জানো, প্রতি বছর এক বিরাট সংখ্যক নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মানুষের বেশীর ভাগই বৃদ্ধা মহিলা? তৃতীয়ত, মেয়েদের শ্রমশীলতার প্রশ্নটা খুবই সঙ্গত। সত্যি, ঘরকন্নার কাজে বা সন্তান পালনে মেয়েরা প্রচন্ড শ্রম করেন। কিন্তু আমি বলবো, বহু ক্ষেত্রে এর অনেকখানিই অপ্রয়োজনীয়, এমনকি ক্ষতি-কারক পন্ডশ্রম। এগুলো অনেকটা সামাজিক শ্রম হতে পারতো, কিন্তু তার জন্য ভিন্নতর সমাজব্যবস্থা দরকার। কিন্তু নিদেনপক্ষে এগুলো পারিবারিক শ্রম হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে পুরুষরা যেমন অসহযোগী, মেয়েরাও তেমনি খুঁতখুঁতে, বাতিকগ্রস্থ, ছুঁৎমার্গী। খাওয়া-দাওয়া-পুষ্টি-পরিচ্ছন্নতার ধারণা পাল্টালে রান্নাবান্না ঘরকন্নার কাজ অনেক কম সময়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমাধা করা যায়। আর বাচ্চা মানুষ করার ব্যাপারে তো আগেই বলেছি, এটা মা'র বিশেষ দায়িত্বের ব্যাপার নয়। একটা সময় পরে বেশী মনোযোগ দিয়ে, অতি মাত্রায় সাবধানী হয়ে মা-বাবারা বাচ্চাদেরও যেমন অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনেন, তেমনি নিজেদের জীবনটাকেও করে তোলেন আনন্দহীন, পঙ্গু। নীপার ক্ষুব্ধ-জিজ্ঞাসা—কিন্তু বলতো, তোমার বর্ণনামত মেয়েদের একাংশের এই রূপ যদি সত্যিও হয়, তবে তা কি পুরুষদের চাওয়ার আয়নাতেই নয়? শিল্পে সাহিত্যে কি এসবেরই জয়গান গাওয়া হয় না?

—বিলকুল ঠিক। পুরুষদের আচরণও পরিপূরক। নারীকে ছোট করে রেখে, তার আচরণের গন্ডী বেঁধে দিয়ে পুরুষই ঘুষ দিয়েছে, প্রশ্রয় দিয়েছে, আবেগচালিতা হবার সুযোগ দিয়েছে। তাই আজ যদি কোন পুরুষ চায়ও—বিয়ের চিরাচরিত পদ্ধতি, পণযৌতুক, স্ত্রীর দাসীবৃত্তি, মনুষ্যত্বহীনতার বেড়াজাল ছিন্ন করে সাধারণ, যৌথ শ্রমশীল জীবন যাপন করবে, তবে মেয়েরাও সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মা-জননীদের ভূমিকাও তুচ্ছ নয়। বলতে ইচ্ছা হয়—চল্লিশ কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ পুরুষ করে মানুষ করোনি; অথবা বলতে পারি—রেখেছ রমনী করে মানুষ করোনি! এবং সিদ্ধান্ত এটাই বেরিয়ে আসে যে পারস্পরিক দোষারোপ একটা কানা গলি—একটা অবৈজ্ঞানিক সামাজিক পরিমন্ডলে নারী পুরুষ উভয়ে উভয়ের পরিপূরক আচরণ ক'রে অত্যাচার যন্ত্রণা মৃত্যুর এক ভিসিয়াস সাইক্লে বাঁধা পড়েছে।

—সম্প্রতি পণ ও নারী-নির্যাতনবিরোধী আইন আরও কঠোর করা হ'চ্ছে, তাতে নিশ্চয়ই সুফল মিলবে—বিজন যেন স্বগতোক্তি ক'রে।

নীপা ঝাঁঝের সঙ্গে বলে—আইন তো কতবারই কঠোর থেকে কঠোরতর হল, তার প্রয়োগও তো করবে সেই পুরুষরাই, আইনের কথা আর তুলো না। তবে নারীমুক্তি আন্দোলন যদি জোরদার হয় তবেই হয়তো বাস্তবে আইনগুলোর কিছুটা প্রয়োগ হতে পারে।

—সে আশাও তোমার দুরাশা নীপা—অনিমেষ যেন উদাস—সবই ভাবের ঘরে চুরি। আইন তো একপক্ষ কাউকে দোষী সাব্যস্ত করেই খালাস। ক্ষেত্রবিশেষে তার প্রয়োজন থাকলেও, আসল জায়গাটা তো এড়িয়েই চলছি আমরা। নারীকে নারী রেখেই তার অধিকার দেবার চেষ্টা বা পুরুষকে পুরুষ রেখেই কর্তব্য করার কথা বলার মধ্যে স্ববিরোধ দেখতে পাই না আমরা, এটাই আশ্চর্য। আমাদের তথাকথিত প্রগতি-

শীল রাজনৈতিক আন্দোলনও এতাবৎ পারিবারিক কাঠামোকে, আচার-অনুষ্ঠানকে অক্ষুণ্ণ রেখেই চলতে চেয়েছে, না পারছে আন্দোলনকে গতিশীল করতে, না রক্ষা করতে পারছে পারিবারিক শান্তি সম্প্রীতি। যে পুরুষ যত বেশী 'প্রগতিশীল', সে তত বেশী করে "ঘরোয়া" ব্যাপারগুলি মেয়েদের উপর ছেড়ে দিয়েছে—প্রগতিশীল পুরুষদের নিজেদেরই ঘরে ঘরে আজ অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে।...এদেশের নারী মুক্তি আন্দোলনের মধ্যেও আমি—তেমন কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না। যদিও অধিকার-মর্যাদা-মনুষ্যত্বের দাবী নিয়ে নারীর এগিয়ে আসাটাই একটা বড় ব্যাপার তবুও, না বলে পারছি না, এ আন্দোলনও একই ধরনের ভ্রান্তি, অসম্পূর্ণতা ও একপেশেমির রোগে আক্রান্ত। একটা উদাহরণ দিই—পিস্তল বন্দুক জাতীয় খেলনাগুলিই শিশুপুত্রদের ভবিষ্যৎ অত্যাচারী পুরুষের দীক্ষা দেয়। তাই আওয়াজ উঠেছে, অত্যন্ত সঠিকভাবেই—take the toys from the boys; কিন্তু শিশু-কন্যাদের মধ্যে অলঙ্কারের নেশা জাগানের বিরুদ্ধে কোন সরব উচ্চারণ কানে আসে না। অথচ, আমার মনে হয়, মেয়েদের অলঙ্কার, বিশেষতঃ স্বর্ণালঙ্কার মোহ যতদিন না ঘুচছে, ততদিন সেগুলি নারী-পুরুষের মধ্যে বিভেদের দেওয়াল হয়েই থাকবে। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, শুধু নারীর নয়, পুরুষেরও মানুষ হয়ে ওঠাটা জরুরী, এবং তা আন্দোলন-সাপেক্ষ, অথচ আমাদের কোন আন্দোলনেই সেই পরিপূরক উপাদান নেই।...শেষ করার আগে আরডিয়া স্কাইব্রেকের "গোড়ার পদক্ষেপ ও ভবিষ্যৎ উল্লম্ফলন প্রসঙ্গে" নামক বই ("of Primeval Steps and Future Leaps"—Ardea Skybreak, Banner Prss, Chicago, 1984) এর প্রতিপাদ্য বিষয়টির উল্লেখ করতে চাই আমি। স্কাইব্রেক দেখিয়েছেন—'উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে' মানুষ যখন সবে দুপায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে শিখছে, ভার বইতে শিখছে, সেই তখনই সামাজিক শ্রমের বিভাজন ঘটে গেছিল লিঙ্গভেদ অনুযায়ী, বনজঙ্গল থেকে খাদ্য আহরণ করতো প্রধানত মেয়েরাই; তাদেরই জমানো উদ্বৃত্ত খাদ্য সম্ভব করে তুলেছিল পশুশিকার, কালক্রমে যাতে পুরুষরাই প্রধান ভূমিকা নেয়। প্রচলিত মতের বিপরীতে তাই তিনি বলেছেন—পশুশিকার কখনই (খাদ্য) আহরণের আগে আসেনি, আর মাংস কখনই নিয়মিত ও পর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান দিতেও পারেনি। কন্দ, মূল, লতা-পাতা-ফল আহরণ করতে করতে নারীরাই সূচনা করেছিল কৃষির, মানুষের। জয়যাত্রার বৈপ্লবিক সূচনায় নারীর এই ভূমিকার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে স্কাইব্রেক বলেছেন—"এবারও মনুষ্যপ্রজাতির স্ত্রীরাই ক্রান্তিকারী এবং আবশ্যিক ধরনের সামাজিক বৈষম্য ও অত্যাচার থেকেও মানবতার সামগ্রিক মুক্তি"। এবং আমি আর একটু যোগ করব—সেটা সম্ভব হবে একমাত্র তখনই যখন নারী আন্দোলন তার বর্তমান গন্ডী ছাপিয়ে পুরুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকেও করবে আত্মস্থ, অবশেষে জোয়ার তুলবে মানবতার মুক্তি আন্দোলন সাগরে।

—সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চলো এবার ওঠা যাক—নীপা তাড়া লাগায়।

বিজন বলে—হ্যাঁ, যেতে হয় এবার। কিন্তু অনিমেষ, তোর সব কথার নীট মেসেজ কি তাহলে এই যে সামগ্রিক পরিবর্তন ছাড়া কোন পথ নেই? এ তো পুরনো আপ্তবাক্য, যেভাবেই বলিস না কেন।

—সামগ্রিক পরিবর্তন না হলে কিছুই হবার নয়, এ আমি বলতে চাইনা। কিন্তু আংশিক ফললাভের জন্যও দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা সামগ্রিকতা অবশ্যই দরকার। আমার বক্তব্যের সারসংক্ষেপ আমি এভাবে রাখতে চাই; নারী পুরুষের বৌদ্ধিক পার্থক্যের কোন রকম বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যদিও নেই, যদিও নারী পুরুষ পরিপূরক ও দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে জীববৈজ্ঞানিক ও সামাজিক উভয় অর্থেই একে অপরকে সৃষ্টিতে অংশ নেয়, তবুও এ উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটছে না সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক আন্দোলনে, কিংবা নারী আন্দোলনে।.... যে অবৈজ্ঞানিক ভাবনা-অভ্যাস, যুক্তিহীনতা আমাদের জীবনে আধিপত্য কায়েম করে রেখেছে, পণ-মৃত্যু তার একটি লক্ষণমাত্র। সেই হিমবাহের ভাসমান সামান্য অংশের প্রান্ত ছুঁয়ে গেছে আমাদের আলোচনা। কিন্তু একথা কি আমরা বলতে পারি না যে যারা চায়—অত্যাচারিত শোষিত মানবাত্মার মুক্তি, যারা চায় নারী মুক্তি, যারা চায় ব্যাপক জনজীবনে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার, তাদের সকলেরই আশু কর্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র এটি?...

[রচনাটির জন্য বন্ধুদের অনেকের কাছ থেকেই বইপত্র, আলোচনা ও আরও নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। কিন্তু মতামত ও ভুলত্রুটি একান্তই নিজস্ব। —স্বঃ গুঃ]

With Compliments From :

SINHA TRADERS

GOVT. CONTRACTOR & SUPPLIERS.

10 Ghatack Road, Kanchrapara,
24-Parganas. (NORTH)

আগামী দশ বছরের জন্য প্রস্তুতির পক্ষে

দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী

দশ বছর ধরে একটা কাগজ চলছে যখন, নিশ্চয় একটা সামাজিক প্রয়োজন সে মেটাচ্ছে। নইলে লোকে কিনতও না, লেখাও পাঠাত না, চালাবার জন্য সময়ও দিত না। বিজ্ঞান ও কারিগরি'র বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ যখন মানুষের ক্ষতিও করছে, তখনও সেই প্রয়োগের নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতে নেই, পুঁজিবাদ মানুষের বিজ্ঞান চিন্তাকেও পণ্য করেছে, সেই পণ্য মানুষের হাত ছেড়ে বাজার ঘুরে ফিরে আসছে মানুষকেই আক্রমণ করতে। এই উদ্বেগ বেশ কিছু বছর ধরেই ফুটে বার হচ্ছে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' মারফৎ। পারমাণবিক কারিগরি, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, দূষণ, ওষুধ ও মানসিক চিকিৎসার অপব্যবহার, একের পর এক বিষয়ে 'বি-ও-বি' এই কর্তব্য যথাসাধ্য পালন করে চলেছে।

দশ বছর আগে যখন কাগজ বার হয় তখন প্রেক্ষিত ছিল কিছুটা অন্য রকমের। পশ্চিম বাংলায় সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে ও বিশেষ করে 'জরুরী অবস্থা'র মধ্যে বিজ্ঞানকর্মীরাও হাঁসফাঁস করছিলেন, ক্রমে তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ঝাঁজও অনেকটা কমে এসেছিল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানকর্মী, বিজ্ঞানশিক্ষক, গবেষক ও ছাত্ররা মিলে তৈরি করেছিলেন 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা,'—এস. ডবলু. এফ। এই সংগঠনের পক্ষ থেকেই 'বি-ও-বি' প্রকাশিত হয়।

এস. ডবলু. এফ. মোটের ওপর তিনটি কাজ তখন করতে চেয়েছিল: 1. দেশে ও পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও কারিগরি নিয়ে গবেষণা ও তার প্রয়োগ সংক্রান্ত নীতির মূল্যায়ন ও সমালোচনা, 2. গবেষণা ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে গণতন্ত্র ও বিজ্ঞানকর্মীদের দাবিদাওয়ার স্বপক্ষে লড়াই, 3. সমাজ ও জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগের পক্ষে প্রচার। 'বি-ও-বি'-তেও এই তিন বিষয়ে লেখা ছাপা হবে বলেই ভাবা হয়েছিল। তবে 'বি-ও-বি'র নিজস্ব সত্তার একটা স্বীকৃতি ছিল। নিছক সাংগঠনিক মুখপত্র হিসাবে 'বি-ও-বি'কে কখনও দেখা হয় নি।

এস. ডবলু. এফ-এর সঙ্গে বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়ন, সংগঠক ও কর্মীরা যুক্ত হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়ন-ভিত্তিক কাজকর্মে এস. ডবলু. এফ. এর একটা সমন্বয়সাধক ভূমিকা এই সময় কিছুটা পরিমাণে ছিল। পাশাপাশি, এস. ডবলু. এফ-এর প্রচার ও বি-ও-বি'র লেখা এক সব প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানকর্মীদের নিছক পেশামুখী কূপমণ্ডূকতাকে খাড়া করছিল বিজ্ঞানচর্চা কেন ও তার ফল কী ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, এ ধরনের অস্বস্তিজনক প্রশ্নের সামনাসামনি।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হল। সেই তরফ থেকেও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়নগুলির সমন্বয় সাধনের আলাদা একটা প্রচেষ্টা শুরু হল।

যদি এস. ডবলু. এফ-এর মাধ্যমে এই সমন্বয় প্রচেষ্টা রূপ নিত, তা হ'লে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে সতর্ক, সুগভীর সমালোচনার যে ধারা গড়ে উঠছিল, তার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকর্মীদের স্বাধীন অস্তিত্বের লড়াই যুক্ত হয়ে বিজ্ঞানকর্মীদের পেশামুখী অন্তঃপুরের অবগুণ্ঠনে আলোড়ন তুলে সদা প্রশ্নশীলতার তাজা হাওয়ার এক পাল্টা প্রভাব দানা বাঁধতে পারত। বিজ্ঞান চর্চা ও তার ব্যবহারের যথার্থ মূল্যায়ন এবং বিজ্ঞানকর্মীর স্বাধীনতার অভিন্ন মঞ্চে বিভিন্ন স্তরের বিজ্ঞানকর্মী ও গবেষক ছাত্রদের সম্মিলিত শক্তি সংগঠিত আকার নিতে পারত।

"কিন্তু যে দিশা বি-ও-বি বেছে নিয়েছে তা নিয়ে বেশ কিছু সমস্যা জমা হচ্ছে"

"ওষুধের অপব্যবহার না ওষুধের ব্যবহারে ঘাটতি কোনটি আমাদের দেশে বেশী বড় সমস্যা? কোনটি নিয়ে প্রচার বেশী জরুরী?"

কিন্তু সমস্যা এল দু'দিক থেকে। বামফ্রন্টের দলীয় সদস্য ও সমর্থকরা চাইলেন দলীয় নিয়ন্ত্রণ। এস. ডবলু. এফ-এ তৎকালীন যে মিশাল ছিল তাতে এটি সম্ভব হত না। আর অন্যরা আবার ইউনিয়ন কাজকর্মের চাকচিক্যহীন ও সময়সাপেক্ষ রুটিনে প্রবেশ করতে চাইলেন না। ফলে কিছু কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়ন দলীয় নিয়ন্ত্রণাধীন 'জ্যাকারি' সংগঠন করে এস. ডবলু. এফ. থেকে কার্যত আলাদা হয়ে গেলেন। এস. ডবলু. এফ-এর প্রধান কাজ দাঁড়াল সেমিনার ও 'টক'-এর আয়োজন। বিজ্ঞানকর্মীদের দৈনন্দিন বা দূরপাল্লার অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া এবং আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কার্যকরী লড়াইয়ের সঙ্গে এস.ডবলু.এফ. তথা 'বি-ও বি'র সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। বিজ্ঞান গবেষণা ও শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতরে এস. ডবলু. এফ. ও 'বি-ও-বি'র চিন্তার প্রভাবের গণ্ডী সংকুচিত হতে থাকল, পেশাদার বিজ্ঞানকর্মীদের চিন্তাভাবনার উপাদানগুলি থেকে এস. ডবলু. এফ ও 'বি-ও-বি' বঞ্চিত হতে শুরু করল।

এমন অবস্থায় 'বি-ও-বি' খুঁজতে থাকল স্বাধীন সত্তা ও বাঁচার স্বতন্ত্র লক্ষ্য। সেই সন্ধানই তার নজরকে কেন্দ্রীভূত করল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ ও এমন কি বিজ্ঞানচর্চার লক্ষ্যস্থাপনা নিয়ে বিশ্লেষণ ও সমালোচনায়।

এই কাজ যে 'বি-ও-বি' আদৌ করতে পেরেছে এবং করে যেতে পারছে

এটাই তার সাফল্য, কারণ সরকারী বা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতার জালের বাইরে থেকে স্বাধীন কাজকর্মের সুযোগ সুবিধা গত দশ বছরে ক্রমাগতই কমে এসেছে।

কিন্তু যে দিশা 'বি-ও-বি' বেছে নিয়েছে তা নিয়ে বেশ কিছু সমস্যা জমা হচ্ছে। কয়েকটি উদাহরণ ধরলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে পারে।

1. এখনই ভূমি সংস্কারে আকাঙ্খিত সংস্কার হচ্ছে না। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার না করে ফলনশীলতা এখনই কী ভাবে বাড়ানো যেতে পারে? বিকল্প প্রযুক্তি যথা জৈব সার প্রক্রিয়া কি চাষীর হাতে তুলে দেওয়ার অবস্থায় রয়েছে?

2. ওষুধের অপব্যবহার না ওষুধের ব্যবহারে ঘাটতি (প্রয়োজনে ওষুধ না পাওয়া বা কুসংস্কারের জন্য ওষুধ ব্যবহার না করা) কোনটি আমাদের দেশে বেশী বড় সমস্যা, কোনটি নিয়ে প্রচার বেশী জরুরী?

3. দূষণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা চালু করা না শিল্প প্রতিষ্ঠা প্রতিরোধ করা, কোনটি আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খায়?

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি না রাসায়নিক সার বা কীটনাশক অপরিহার্য। ওষুধের যে অপব্যহার শহুরে উচ্চ মধ্যবিত্তদের ডাক্তাররা করে, তাতে আমার খুবই রাগ হয়। মোটর গাড়ি ও কারখানাগুলি যে জলবায়ু দূষিত করছে, একজন হাঁপানিরুগী হিসাবে সরাসরিই আমি তার দ্বারা আক্রান্ত। কিন্তু এই যে প্রশ্নগুলির উদাহরণ দেওয়া হ'ল সেগুলি আমার মনেও আসে, এবং 'বি-ও-বি'তে সেগুলির উত্তর পাই না।

> "দূষণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা চালু করা না শিল্প প্রতিষ্ঠা প্রতিরোধ করা কোনটি আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খায়?"

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগে আধুনিক বিকৃতি উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তাই এই বিকৃতির বিপক্ষে জনসমাবেশ বাড়ছে। কিন্তু আমাদের দেশের অন্য ধরনের নানা সমস্যার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে এই বিকৃতির গুরুত্ব পশ্চিমের চেয়ে কমই হতে পারে, পরিমাণের দিক দিয়েও এমন কি বিপদ পশ্চিমের চেয়ে বেশিও যদি হয়। তিনটি উদাহরণের প্রথমটিই ধরা যাক। পশ্চিমে বর্জিত যত বিপজ্জনক রাসায়নিক প্রযুক্তি সব এসে পড়ছে আমাদের ভাঙা কুলোয়। তবু শিশুমৃত্যু, অনাহার, কর্মাভাবের পাশাপাশি এই বিপদ আমাদের দেশের সাধারণ কৃষকের কাছে গ্রহণযোগ্য মাত্রার মনে হতেই পারে। এই বছরের ফসল আর মজুরির ওপর যার শিশুর পরের বছর পর্যন্ত জীবনধারণ নির্ভরশীল, দশ বছর পরে ক্যানসারে মৃত্যুর ঝুঁকি সে জেনেশুনেও নিতেই পরে।

'বি-ও-বি' পড়তে থাকলে সাধারণ, অনুসন্ধিৎসু, 'আন-কমিটেড' পাঠকের মনে এ ধরনের প্রশ্ন জাগতে থাকবে। আর 'বি-ও-বি'র যদি এমন পাঠক না থাকে তবে তো ভয়ের কথা। তাহ'লে 'বি ও বি'ও কি আরো একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে, যার চারপাশে কেবল তারাই জড়ো হয় যারা মনে করে এ ধরনের প্রশ্নের কেবল একই ধরনের উত্তর হতে পারে? 'বি-ও-বি'তে বিতর্ক হয় বটে, কিন্তু এ ধরনের প্রশ্নে একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর লোকজনের মধ্যেই তা যেন সীমাবদ্ধ থাকছে।

যদি বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণ ভাবেই স্বীকৃত হত তবে এই বিকাশ স্বাভাবিক বলা যেত। কিন্তু বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থকরা সংখ্যালঘু বলেই মনে হয়। 'বি-ও-বি' কি তাহলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচারপত্র হতে চলেছে? নানা দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া না একটি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচার? 'বি-ও-বি' এই পথসন্ধির সামনে দাঁড়িয়েছে দশ বছর পরে।

যে উদাহরণগুলি আলোচিত হ'ল সেগুলি নিয়ে সমাজে ও বিজ্ঞান কর্মীদের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মত'ও আছে। কিন্তু সেই মতগুলির জোরালো উপস্থাপনা 'বি ও বি'তে পাওয়া যায় না। ফলে 'বি-ও-বি' থেকে যাঁরা এ ধরনের ব্যাপারে মতগঠন করেন, নিজেদের ছোট গণ্ডীর বাইরে এলেই এমন অনেক সব প্রশ্নের সামনে তাঁদের পড়তে হয় যেগুলি সম্বন্ধে তাঁদের চিন্তাভাবনা অপরিণত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে।

> "আরো একটা বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। যে সব বিষয়ে 'বি-ও-বি' লিখছে সেই সব বিষয়ে যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁদের মধ্যে 'বি-ও-বি'কে ঘিরে একটা প্রত্যাশা গড়ে উঠছে, 'বি-ও-বি' কিছু করুক। 'বি-ও-বি'র পক্ষে বলা মুস্কিল, 'আমরা কাগজে তুলে দিলাম, এবার যা করার আপনারা করুন'।"

পেশাদার বিজ্ঞানকর্মী, শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্রদের সঙ্গে সাংগঠনিক যোগাযোগ রাখতে এবং তাঁদের সকল মতামতকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে বাধ্য থাকলে, এই ধরনের বিকাশের সম্ভাবনার ভয় কম থাকত। মানুষের নির্দিষ্ট কোনো একটি অংশবিশেষের প্রতি নির্দিষ্টভাবে দায়বদ্ধ থাকলে, মতামত গঠনে দায়িত্ববোধ বাড়ে এবং সেই অংশের মধ্যে যে নানা ধরনের চিন্তাভাবনা রয়েছে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় কোনো পোষা কথামালা তৈরি হতে পারে না। 'বি-ও-বি' এ ধরনের কোনো নির্দিষ্ট অংশের থেকে সাংগঠনিক ভাবে প্রাণরস টানছে না, তাই গণ্ডীবদ্ধ হওয়ার, নিজেদের গণ্ডীর কিছু প্রশ্নাতীত আপ্তবাক্য-নির্ভর হাওয়ার একটা বিপদ ঘনাচ্ছে।

আরো একটা বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। যে সব বিষয়ে 'বি-ও-বি' লিখছে সেই সব বিষয়ে যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁদের মধ্যে 'বি-ও-বি'কে ঘিরে একটা প্রত্যাশা গড়ে উঠছে, 'বি-ও-বি' কিছু করুক। 'বি-ও-বি'র পক্ষে বলা মুস্কিল, 'আমরা কাগজে তুলে দিলাম, এবার যা করার আপনারা করুন।' বিশেষ করে দূষণের শিকার যাঁরা হয়েছেন বা হতে চলেছেন তাঁরা এই প্রত্যাশার শরিক।

এ সব ব্যাপারে কার্যকরী কিছু করতে হলে জনমতকে সংগঠিত করতে হবে, 'লবি' তৈরী করতে হবে, আদালত, সংবাদপত্র, সরকারী বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দলকে কাজে লাগাতে হবে। পরিকল্পনা ও রুটিন মাফিক একাধিক কাজ দীর্ঘ দিন ধরে করে চলতে হবে। মানুষকে জড়ো করে তাঁদের মিলিত শক্তিও প্রদর্শিত করতে হবে। বালিয়াপালের মতো সমস্যা একক। প্রতিপক্ষের চূড়ান্ত শক্তি। আর দূষণ অনবরত। কোনো প্রতিপক্ষ শক্তিশালী, কোনো প্রতিপক্ষ দুর্বল। মোটকথা দরকার পুরোদস্তুর স্থায়ী সংগঠনের। 'বি-ও-বি'র পাশাপাশি এই কাজে পারদর্শী সংগঠন তৈরি না হলে 'বি-ও-বি'তে প্রকাশিত মতগুলি কাগজেই থেকে যাবে। বি-ও-বি'র আন্তরিকতা, পরিশ্রম ও যত্নের ফল দাঁড়াবে সৌখীন মজদুরি।

এই সংগঠন যে গড়ে ওঠে নি তার দায়, বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা বা গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র বা 'বিজ্ঞান আন্দোলনের' আরো নানা কেন্দ্রের সীমাবদ্ধতার, দায় 'বি-ও-বি'র একার নয়। দোষারোপ বা দায়ভাগের প্রশ্নই তোলা হচ্ছে না। 'বিজ্ঞান আন্দোলন' বলে যা গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে তার সীমাবদ্ধতার কারণ স্বতন্ত্রভাবেও অনুসন্ধানযোগ্য। খালি এটুকুই বলা হচ্ছে, যে ভূমিকা 'বি-ও-বি' নিয়ে ফেলেছে তার ফলে অপ্রতিরোধ্য কিছু দাবি এসে হাজির হচ্ছে তার দরবারে।

এই দাবি মিটাতে গেলে অনেক মানুষকে জড়ো করতে হবে। যেহেতু পশ্চিমী দেশগুলির মানুষের অন্যান্য সমস্যার তুলনাতেও আলোচ্য সমস্যাগুলি (পারমাণবিক কারিগরি, রাসায়নিক সার, ওষুধ, দূষণ) গুরুত্বপূর্ণ, তাই সেখানে সাধারণ জনতাকেই সমাবেশিত করা যায়। আমাদের দেশেও বিশেষ সমস্যায় আক্রান্ত জনতাকে তাৎক্ষণিকভাবে সমাবেশিত করা যেতে পারবে, কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে একটা স্থায়ী সমাবেশ গড়ে তোলা কঠিন হবে। তাই মানুষের বিশেষ কোনো অংশের মধ্যে নির্দিষ্ট ও ধারাবাহিক কাজকর্ম চালিয়ে একটা নিজস্ব ভিত্তিভূমি, নিজস্ব 'কনস্টিটুয়েন্সি', একটা 'বিজ্ঞান লবি' তৈরি না করতে পারলে স্থায়ী কার্যকরী ক্ষমতা নাগালের বাইরেই থেকে যাবে।

এই দিক থেকেও বিজ্ঞানকর্মী, শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্রদের মধ্যে সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপের গুরুত্ব বোধ করা যায়। এঁদের মধ্যে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণশীলতা, নিরাপত্তাবোধ, নিষ্ক্রিয়তা ও অনীহা বাড়তে থাকে, কিন্তু এই রক্ষণশীলতার সঙ্গে লড়াই করে একটা কার্যকরী কর্মসূচীর স্বপক্ষে এঁদের নিয়ে আসার কঠিন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই আন্দোলনের কর্মী ও সংগঠন তৈরি হবে। অপর দিকে এই প্রক্রিয়াই মতামত ও কর্মসূচীকে বাস্তবসম্মত রাখবে।

নইলে অল্প কিছু সমমতাবলম্বী লোকের একবগগা কথাবার্তার প্রকোপে বিজ্ঞানকর্মী ও এমন কি তাৎক্ষণিকভাবে আক্রান্ত নয় এমন সকল মানুষেরই কাছে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' ধীরে ধীরে কিছু পাগলাটে লোকের প্রলাপকথনের বাহক বলে গণ্য হয়ে পড়তে পারে। এই বিচ্ছিন্নতা হবে মারাত্মক। এবং এই বিচ্ছিন্নতাকে গৌরব মনে করাটা হবে উল্টানো 'এলিটিজম' মাত্র।

যে 'কনস্টিটুয়েন্সির কথা বলা হল সেটি যদি পছন্দ না হয় বা যদি মনে হয় এই 'কনস্টিটুয়েন্সি'তে দন্তস্ফুট করাটাই অসম্ভব বা অনেক সময়-সাপেক্ষ, তবে অন্য 'কনস্টিটুয়েন্সি'র কথা ভাবা হোক। মোট কথা সাংগঠনিক কাজ ছাড়া কেবল 'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ' করে চললেই সমস্যাগুলি কাটবে না।

" মোট কথা সাংগঠনিক কাজ ছাড়া কেবল 'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ" করে চললেই সমস্যাগুলি কাটবে না। "

আরো কথা থাকে। মানুষের জীবনের সমস্যাগুলি শরিকী ভাগাভাগির মুখদর্শনবিহীন অবস্থায় থাকে না। একটা সমস্যা নিয়ে বলতে গেলে আরো পাঁচটা সমস্যা এসে পড়ে। 'আমরা মশাই চণ্ডী পাঠ-কর্তা, জুতোসেলাইয়ের জন্য মুচি দেখুন', পীড়িত, উৎপীড়িত মানুষকে এ কথা বলে দেওয়া কঠিন। তার মানে এই নয় যে, জুতো সেলাইয়ের বাক্স হাতে চণ্ডীপাঠের আসরে যেতে হবে, বা ঐ ভয়ে ছেঁড়া জুতো চোখে পড়লেই চোখ বুজে ফেলতে হবে। জুতো সেলাই যারা করে চণ্ডীপাঠকর্তাদের তাদের সঙ্গে লেনাদেনা রাখতে হবে। নিজেদেরও একটা 'বিজ্ঞানকর্মী লবি' না হোক একটা 'বিজ্ঞান লবি' তৈরি করতে হবে, আবার এই ধরনের নানা 'লবি', ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি, মহিলা সংগঠন, ছাত্র ইউনিয়নের সাথে সমন্বয়ের জাল বুনে ফেলতে হবে।

রক্ষণশীল বিজ্ঞানকর্মী আর বর্তমানের ভারে অবনতমস্তক সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আধুনিক ব্যবহারের মর্মার্থ অনেক ধৈর্য সহকারে বোঝাতে হবে। তার জন্য বি-ও-বি'র গতির ও দিশার কিছুটা পরিবর্তনই বোধহয় কাম্য। কিন্তু স্বার্থান্বেষী, উচ্চাভিলাষী লোকজন আর রাজনৈতিক মুনাফাশিকারীদের ব্যাপারে একটু অধৈর্য হলেই ভাল। আমরা শুনেছি যে সৎ রাজনীতি গণ-আন্দোলনের পথে আলো দেখায় আর ক্রমাগত দেখছি কেমনভাবে বদ রাজনীতি গণআন্দোলনের হাতে ধরায় হারিকেন। ফলে গণ-আন্দোলনের প্রতি বিশ্বস্ত যাঁরা তাঁদের পক্ষে রাজনৈতিক কর্মীদের একে একে বাজিয়ে নেওয়া পর্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখাই বাঞ্ছনীয়। এত কথা অপ্রাসঙ্গিক নয়। এ ব্যাপারে স্বচ্ছ ও দৃঢ় না হলে কলকাতার ভূপাল কেলেংকারি বারবার ঘটবে। 'বি-ও-বি' সেই কেলেংকারির দর্শকমাত্র থাকতে পারে নি, ভবিষ্যতেও পারবে না।

'বি-ও-বি'র সাফল্যের ও গ্রহণযোগ্যতার বড় কারণ এ ধরনের অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বা চক্রের অনুপস্থিত। গ্রহণযোগ্যতার আজকের পশ্চিমবাংলায় দুর্লভ। এই দুর্লভ ধন 'বি-ও-বি' সঞ্চয় করেছে বলেই তার একটা ভবিষ্যৎ আছে, আর তাই তার চলার পথের খানাখন্দের ব্যাপারে হয়তো একটু চোখে আঙ্গুল দিয়েই দেখানোর ঝুঁকি নিতে হলো। □

'বি-ও-বি'র এক দশক ঃ "স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ"

সুব্রত ভট্টাচার্য

মুক্তির দশকে পরিণত হ'তে না পারলেও পশ্চিমবাংলা তথা গোটা ভারতবর্ষে সত্তরের দশক আগামী দিনের ইতিহাস-রচয়িতাদের কৌতূহল উদ্রেক করতে বাধ্য—ঘটনার ঘনঘটার জন্যই। আর, সে ঘটনাসৃষ্টির পেছনে শুধু শাসক শ্রেণীর আঘাতের কথাই থাকবে না—জনগণের, অন্তত একটি অংশের, সক্ষম প্রত্যাঘাতের স্বপ্ন ও প্রচেষ্টার কথাও থাকবেই সেখানে। সমাজবিপ্লবের কথা মানেই ফিসফিস ; মানে গরম গরম কথার আড়ালে আসলে পাপোষের নিচে চোরাই চালান করা আপোষের মিঠে, মিহি বুলি—এ তত্ত্ব প্রচারের মূল প্রতিবাদ ও প্রত্যাখানই হ'ল সত্তরের বজ্রনির্ঘোষ। বরং, বিপ্লব হ'ল জনগণের উৎসব—এটাই সরবে সেদিন প্রচারিত হ'য়েছিল। খুব খুঁতখুঁতে সমাজবিজ্ঞানী হয়তো 'জনগণ' শব্দটি পুরোপুরি ব্যবহার করতে চাইবেন না—সূক্ষ্মতার দাবী মেটাতে বলবেন "জনগণের একটি সচেতন অংশ"। তা বলুন! তবে, আমরা এখানে সে সব সামাজিক তত্ত্বকথার বিশদ বিবরণ বিশ্লেষণে যাচ্ছি না।

সব সচেতনতাই, অবধারিত ভাবে, ছায়া ফেলে দেশীয় সংস্কৃতির মুকুরে। ফলে, বিজ্ঞান-সংস্কৃতিও বাদ যায় না—যায়ও নি এক্ষেত্রে। বিজ্ঞান ও বিপ্লবের (অর্থাৎ সমাজ-পরিবর্তনের) সম্পর্কটি বেশ নিবিড়। একথা সত্য যে বিবেক ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক ইতিহাসের বিচারে কোনো সময়ই প্রায় রৈখিক নয়;—অন্তত সু-নৈতিকতার ভিত্তিতে। তবু এ দু'য়ের সুসংযুক্তি বাদ দিয়ে সমাজপরিবর্তনের কোনো সুফলই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। মনে হয়, এরকম একটা আন্তর বোধের তাগিদেই সেদিন "পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা"র জন্ম হয়েছিল—যে সংগঠন-উন্মেষের উদ্দেশ্য ছিল সমাজ, বিজ্ঞান ও বিবেকের আন্তঃসম্পর্কটিকে সতত সংবীক্ষণ করা। আর, এ সংগঠনের উদ্যোগেই সেদিন আবির্ভাব ঘটেছিল "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী" (সংক্ষেপে "বি ও বি") নামের একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা-মুখপত্রের। শুধু বিজ্ঞান চেতনাসৃষ্টি নয়, সমাজের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্কের চেহারাটি কেমন-ছিল, কেমন-আছে, কেমন-হওয়া-উচিত, এ সব বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করা, বিজ্ঞাননীতিপ্রণেতা ও সত্যিকারের বিজ্ঞানকর্মীদের সম্পর্কের নানা জট জটিলতা-বিষয়ক অনুসন্ধান চালানো, এবং সর্বোপরি বিজ্ঞানকর্মীদের সমবেত ও সঙ্ঘবদ্ধ করবার কাজে সাহায্যের জন্যই ছিল এ পত্রিকা ও সংগঠন। বিপুল আবেগে গঠিত এ সংগঠনটিতে সেদিন ক'লকাতা কেন্দ্রিক প্রায় সমস্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং পশ্চিমবঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে অন্তত একটা প্রতিনিধিত্বমূলক উপস্থিতি ছিল নানাস্তরের বিজ্ঞানকর্মীদের। ছিল ভারতবর্ষের আরো কিছু বিজ্ঞান-গবেষণাগারের সঙ্গেও কর্মপরিকল্পনাভিত্তিক একটা সুসম্পর্ক। তাছাড়া বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও অংশগ্রহণ ছিল অনেকটাই। তবে, মূলত ছাত্র-গবেষক ও অধ্যাপকদেরই ছিল সংখ্যাধিক্য—এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার পরিচালনায় ও গঠন বৈচিত্র্যে তথা পত্রিকা প্রকাশের মূল প্রেরণার উৎসে সে উপাদান-বৈশিষ্ট্যেরই ট্রাডিশন আজও সমানে চলেছে।

অস্বীকার ক'রে লাভ নেই, কারণ, চোখের সামনে দেখছি, আন্দোলনের ধারা হ'য়ে আসছে ক্রমশ স্তিমিততেজ, সংগঠনের আকার জীর্ণশীর্ণ, পত্রিকার পাঠকসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান না হ'লেও স্থিতিশীল এবং সে সংখ্যাটিও খুব সুখকর নয়; গ্রাহক সংখ্যায় ভাঁটা পড়ছে, পুরোনো অনেক কর্মীবন্ধুরা হতোদ্যম, নিরুৎসাহ। কয়েকজন অবশ্য আন্দোলনের ভিন্নতর খাতে অত্যুৎসাহিতাবশত অন্যচারী হয়েছেন। পুরানোদের দু'চারজন বয়স, কর্মভার, অস্বাস্থ্য, বিদেশগমন, পরিবার-নিশ্চিন্ত জীবনের স্বপ্নময় খাতে অবস্থানের দরুন, হয় চরম উৎসাহহীন হ'য়ে সরে গিয়েছেন, নয় অবশিষ্ট সময়টুকুও ব্যয় করবার কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন না। এগুলো অভিযোগ, অনুযোগের কথা নয়—সময়ের নিজস্ব নিয়মে এরকম ঘটাই খুব স্বাভাবিক। সব সংগঠনেই এরকম ঘটে, ঘটছে এবং ঘটবেও। বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সদস্যসংখ্যা সঙ্কোচন আপাতত একটি অতি বাস্তব—একটি নির্মম সত্য। এতে বুকে ব্যথা-বোধ জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু একচোখো হরিণের মত শুধু এ ক্রমক্ষীয়মানতার দিকটিতেই চোখ বিঁধিয়ে রাখলেও ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হবে। যোগ-বিয়োগের লব্ধি-ফলটাই হ'ল আসল কথা। যেমন নিষ্ঠাবান, পরীক্ষিত ও পুরোনো অনেক বন্ধুদের আমরা নৈকট্য হারিয়েছি গত কয়েক বৎসরে, ঠিক সে সময়েই সংগঠনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে এসেছেন বেশ কয়েকজন তরুণ বন্ধু—যাঁদের তরতাজা চিন্তার প্রভাব, টগবগে উপস্থিতি উর্বরতা বাড়িয়েছে আমাদের কর্মক্ষমতার। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই, আপাতত আমরা খারাপ অবস্থায় আছি, একথা বলার অর্থ যেন এটা না হ'য়ে যায় যে আমাদের কোনো সম্ভাবনা নেই, নেই ভবিষ্যতে উৎক্রান্তি ও উত্তরণের কোনো আশ্বাস—সেদিন, মানে, গত আটই জুন 1987 তারিখে খুব উপযুক্ত সময়ে, সজোরে বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভায় এ কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অগ্রজোপম সুহৃদ্বর শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার মশাই—যিনি এ সংগঠনটির সভাপতি। সময়দৈর্ঘ্য বিচার করলে লিটল্ ম্যাগাজিনের যা গড়পড়তা আয়ুষ্কাল, সেই মাপকাঠিতে "বি-ও-বি" তো বেশ দীর্ঘায়ু হয়েছে বলতে হবে। অনেক ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে পত্রিকাটি আজ দশ বছরের এক কিশোর—হতে পারে সমর্থ সাবালক হ'তে তাকে আরো দীর্ঘ দশ বছরের সংগ্রাম করতে হবে। কেননা, এখনও অর্থনীতিগতভাবে বা সাংগঠনিকভাবে পত্রিকা খুব

স্বনির্ভর নয়। দশ বছর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে একটা আপাত স্বয়ং-সম্পূর্ণতার ভাব অর্জন করলেও, কার্যত, এখনও পত্রিকা একটা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাধীন হ'য়ে উঠতে পারে নি। সংশ্লিষ্ট সবাকার গাফিলতিই এর জন্য কম-বেশি দায়ী। কিন্তু কোনদিনও পারবে কী? গত আটই জুন '87-র বার্ষিক সাধারণ সভায় শুনলাম যে পত্রিকা প্রায় দুই হাজারের কাছাকাছি টাকার ঘাটতিতে চলেছে। বিগত অর্থনৈতিক বছরে একটা প্রতিশ্রুত বিজ্ঞাপনের টাকা না পাওয়ায় নাকি এ বেসামাল বিপদ—কারণ, বছর দুই আগেও শুনেছি "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী" চলেছে না-লাভ-না-ক্ষতি (break-even) গোছের একটা পরিস্থিতিতে। আর, বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিতির স্বল্পতা থেকে সংগঠনিক দুর্বলতার চেহারাটা অনুমান করা খুব অসঙ্গত নয়। এবং সংগঠন যে ভীষণ ঢিলেঢালা চরিত্রের তা তো উদ্যোক্তারা একবাক্যেই স্বীকার করেন। তবু. বোধ করি, সবাই একমত হবেন একটি প্রশ্নে যে পত্রিকাটিকে বাঁচানো প্রয়োজন এবং তা যেভাবেই হোক। কিন্তু কেন?

এই 'কেন'র উত্তর খুঁজতে গেলেই আমরা পেয়ে যাবো 'বি ও বি'র গত দশ বছরের টিঁকে থাকার চাবিকাঠিটি. শুধু তাই নয়; সংগঠন তথা পত্রিকাটির বিকাশ-বৃদ্ধির বীজমন্ত্রটিও সম্ভবত আমরা তাহলেই পাবো হাতের মুঠোয়।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান সংস্কৃতি প্রচারের জন্য, বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পশ্চিমবাংলায় রয়েছে আরো কিছু বন্ধু সংগঠন এবং তাঁদের প্রকাশিত নানা পত্র-পত্রিকা। তবে, এঁদের বেশির ভাগেরই লক্ষ্য বিজ্ঞানকে নিছক বিজ্ঞান হিসেবে সহজপাচ্য ক'রে প্রকাশ করা, ভৌতিকর জ্ঞানের বিষয় না হ'লেও, বেশ-একটা রহস্যময় নতুন জানবার জগৎ হিসেবে বিজ্ঞানকে তারা সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু, "বৈজ্ঞানিক মন সৃষ্টি" ব্যাপারটা একটু ভিন্ন জিনিস। আর 'গণবিজ্ঞান' নামক যে ব্যাপারটা সেটা তো হ'ল তার পরের ধাপ। কিন্তু এ সমস্ত বন্ধু পত্রপত্রিকা, সংগঠনগুলো থেকে "বি ও বি"র ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচী একটু আলাদা; আর, এই অতিরিক্ত দায়িত্বটি হ'ল বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠানের সমস্ত স্তরের কর্মীদের সঙ্ঘবন্ধ করার কাজে পত্রিকাটিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা—যার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানকর্মীদের দৈনন্দিন আন্দোলনে সাধ্যমত অংশগ্রহণ করা। ব্যক্তিগত, জীবিকাগত অসুবিধার অসংখ্য দিক আছে এক্ষেত্রে, ঠিকই, কিন্তু এটা একটা দৃষ্টিভঙ্গীরও প্রশ্ন। সংগঠন শুরুর প্রথম পর্যায়ে আমরা আমাদের সীমিত সাধ্য ও শক্তি দিয়ে বিজ্ঞানকর্মীদের সে সময়ের আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছি; কোথাও কোথাও শরিক হ'য়েছি বললে অত্যুক্তি হবে না; আবার কোথাও কোথাও ক্ষমতার অভাবে পরোক্ষ সমর্থন যুগিয়েই তৃপ্ত থাকতে হয়েছে। ফলে, এভাবে আমাদের একটু পরিচিতি হয়েছে—জনগণ আগ্রহী হ'য়ে এসে কখনো কখনো বিস্তৃত কর্মসূচী সন্ধান করেছেনে। কিন্তু, কোনো দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী আমরা সেদিনেও প্রণয়ন করতে পারিনি—আজও পারিনি, পারছিনা—ফলে, সময়ের নিয়মে হতাশ হ'য়ে তাঁরা ফিরে গিয়েছেন। বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী আমাদের যতটুকু পরিচিতি হয়েছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে ও বুদ্ধিজীবী সমাজে, সেই সুকৃতিটুকুর জোরেই, আমার মনে হয়, পত্রিকাটি আজও টিঁকে আছে। আর বিজ্ঞানকর্মীদের ঐক্যবন্ধ ও সঙ্ঘবন্ধ করার প্রয়াস থেকে ক্রমশ যত দূরে সরে আসছি, পত্রিকার চাহিদাও ততই ক্রমহ্রাসমান হচ্ছে। কার্যত, আজ আমরা উদ্বাস্তু—সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে একটি ছোটতম কক্ষ মাথার ওপর আলো-পাখার নিশ্চিন্ততা সহ বসবার সুযোগটি থেকেও এ মুহূর্তে 'আমরা' উৎখাত হবার পথে। তাই, এখন আমরা আছি আশ্রয়ের সন্ধানে। এবং এ সময়ে চূড়ান্ততম অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এটাই হোক আমাদের প্রথম কাজ।

কিন্তু এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে? না, কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়। দায়ী সময়, দায়ী কম-বেশি আমরা সংশ্লিষ্ট সবাই। যে মুষ্টিমেয় জনের আনাগোনা এখনও বেঁচে আছে তাও অচিরেই শুকিয়ে যাবে ঠিকানাভাবে। সবাকার আন্তরিকতা বিন্দুবিন্দু যুক্ত হ'লেও হয়তো এক্ষেত্রে সিন্ধু সৃষ্টি হ'ত না, একথা ঠিক; কিন্তু অবস্থার এত অবনতি ঘটতে পারতো না কিছুতেই। যে সময়টাতে আমাদের বিকাশের সবে শুরু হয়েছিল, যেটা হ'তে পারতো আমাদের পত্রিকা ও সংগঠনের সুবর্ণ যুগ, ঠিক সে সময়টাতেই চৈতন্য হারিয়ে আমরা রাহুগ্রস্ত হ'লাম। আমাদের কিছু বন্ধু অতি-গণতন্ত্রীকরণের ঝোঁকে সংগঠনে প্রশস্ত করে দিলেন অবাঞ্ছিত বেনোজলের প্রবেশপথ। সবচেয়ে ফলবান সময়টিতে সর্বনাশের বীজ পুঁতে চলে গেলেন তাঁরা—সংগঠন ও পত্রিকার শরীর থেকে তার জীবাণু দূর করা আজ খুব কঠিন কাজ। শ্লথতা আমাদের মাথায় আজ প্রবিষ্ট বিষাক্ত মদের মত। আমরা ভক্ত হ'য়ে পড়লাম অতি-উদারনীতিবাদের, আলস্যেরও। দেখা যাচ্ছে, একজনের একটি সংশয়িত প্রশ্নও একটি লেখা না-ছাপাবার যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে। আবার, প্রায়-অপঠিত অবস্থায়ও কিংবা অন্যমনস্ক-ভাবে-পঠিত এবং বহু ত্রুটিযুক্ত লেখা অসংশোধিত আকারে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর এই ঢিলেঢালা ভাবকে দু'একটি সংখ্যায় প্রায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জাহির করা হ'ল— আপনারা এসে দেখে যান, "আমরা কী রকম ভাবে বেঁচে আছি"—গোছের কথাবার্তা লিখে।

পত্রিকার আঙ্গিক নিয়ে অসংখ্যবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে—

"বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী আমাদের যতটুকু পরিচিতি হয়েছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে ও বুদ্ধিজীবী সমাজে, সেই সুকৃতিটুকুর জোরেই, আমার মনে হয়, পত্রিকাটি আজও টিঁকে আছে। আর বিজ্ঞানকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রয়াস থেকে ক্রমশ যত দূরে সরে আসছি, পত্রিকার চাহিদাও ততই ক্রমহ্রাসমান হচ্ছে।"

আকর্ষণীয় করার সাধ্যাতারিক্ত চেষ্টাও চলেছে—কিন্তু মনে রাখতে হবে এ সবই হ'ল বাইরের চিকিৎসা। তাতে ভেতরের রোগ নিরাময় হবে না। সরল, ঝরঝরে, সুন্দর বাংলায় (বা প্রয়োজনে ইংরেজিতে) সব মনোনীত লেখাপত্র ছাপা হবে—এটা লক্ষ্য হিসেবে বেশ ভালো। কিন্তু, সরলীকরণের নাম ক'রে যদি বিষয়বস্তুকে সম্পূর্ণ তরলীকরণ ক'রে ফেলা হয়—তবে পাঠক বিকর্ষিত হন। আমার নিজের ধারণা, সাংগঠনিক প্রয়াসের অভাবে এবং লেখাগুলোর অতি-তরলীকৃত ঝোঁকের ওপর জোর দেওয়ায় অনেক সিরিয়াস পাঠক আমরা অতীতে হারিয়েছি। পড়াটা সাধারণভাবে যাঁরা পছন্দ করেন না (অর্থাৎ অপেশাদারী পড়াশোনা করাটা), পড়া বিষয়ক সব কিছুতেই তাঁদের অরুচি—সস্তা যৌনপত্রিকার পাতা উল্টে চোখের লালাগ্রন্থি সিক্ত করার বেশি তাঁদের অপেশাদারী পড়াশোনার দৌড় নেই। আর, যাঁরা পড়তে ভালোবাসেন—তিনি শ্রমিকই হোন আর শিক্ষক-অধ্যাপক-অফিসারই হোন—যে কোনো সিরিয়াস ভালো লেখা হাতে পেলেই তাঁরা তা সাগ্রহে পড়বেন—ভাষাগত কাঠিন্য বা সরলতা সেখানে খুব বড় বাধা হয় না। মেসেজ যদি খুব গুরুগম্ভীর হয় মিডিয়াম সেক্ষেত্রে বায়বীয় তরল হতে পারে না—message এবং medium-এর ভেতর একটা সু-সন্ধি না ঘটলে পাঠক না পারবেন জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে, না পাবেন পাঠের অনাবিল ও নান্দনিক একটা তৃপ্তিবোধ। এর অর্থ কিন্তু অকারণে কোনো আরোপিত কাঠিন্যের সপক্ষে যুক্তি সরবরাহ করা নয়। মোটেই তা নয়। কিন্তু, অদূর অতীতের "বি-ও-বি"র কিছু সংখ্যা হাতে নিয়ে খুব খেলো, খুব চটুল কোনো পত্রিকা হাতে পেলাম, 'যা দেখতেই বিরক্তিকর—তার আবার পড়া" গোছের একটা বিতৃষ্ণভাব আমার জেগেছিল—এক্ষেত্রে অন্যদের অভিজ্ঞতা অবশ্যই অন্যরকম হতেই পারে। সে সব সংখ্যা হাতে নিয়ে মনে হয়েছে: অ-পড়ুয়াকে পড়ুয়া, অ-বিজ্ঞানভাবুককে যে-কোন মতে বিজ্ঞানভাবুক, হোমিওপ্যাথভক্তকে শুধু মুদ্রিত অক্ষরের জোরেই হোমিওপ্যাথ-বিদ্বেষী ক'রে ফেলা...এরকম সব নানা অবাস্তব কাজ হাতে নিয়েছে "বি-ও-বি"। ভুল হতে পারে—কিন্তু আমার মনে হয়েছে।

কিন্তু তাই ব'লে সব পরিবর্তনই কি খারাপ হয়েছে? নিশ্চয় নয়। অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে—যা প্রশংসার দাবি রাখে। অনেক নতুন নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে—যেগুলোর প্রয়োজন ছিল। কার্টুন এখন পত্রিকার একটা বিশিষ্ট সম্পদ। এবং এ ব্যাপারে নতুন আসা আমাদের এক তরুণ বন্ধুর অবদান অনেকখানি। অনেকখানি না বলে বরং 'সবটাই' বলা বেশি ঠিক হবে। শুনেছি, অবস্থাগতিকে আঙ্গিক ও প্রকরণে কয়েকটি রদবদল ঘটানো হয়েছে—ব্যক্তিগতভাবে আমি যার ঘোর বিরোধী। এবং আমি চাই, অত্যন্ত জোরের সঙ্গে দাবী করবো যে, সেই অনভিপ্রেত বদলধারা পাল্টে পূর্ববর্তী অবস্থানে 'আমরা ফিরে যাই, আমাদের ফিরে যেতে হবে'।

(ক) পত্রিকার 'সম্পাদকীয়' পুনরুদ্ধার: সম্পাদকীয়হীনতা (যা এখন 'বি-ও-বি'তে চলছে) পত্রিকাতে একটা শূন্যতা ও সৌন্দর্যাভাবে সৃষ্টি করে, পত্রিকার গাম্ভীর্য নষ্ট করে—কেমন একটা মুন্ডিতমস্তক ভাবের জন্ম দেয়। আর, সুঠাম সুলিখিত ও শক্তিশালী সম্পাদকীয় হ'তে পারে একটি পত্রিকার অলঙ্কার তথা অহংকার।

এ ব্যাপারে একটা অসুবিধের কথা শুনেছি। সেটা ঐকমত্য হওয়া বিষয়ে। কিন্তু, এ প্রসঙ্গে Association for Advancement of American Science (AAAS)-এর মুখপত্র Science পত্রিকা আমাদের পথপ্রদর্শক হ'তে পারে: পত্রিকাটিতে অনেক সময়ই সম্পাদকীয় লেখেন পত্রিকার বাইরের কোনো ব্যক্তি এবং তিনি লেখেন তাঁর স্বনামে। সম্পাদকীয় নির্বাচনের দিকনির্দেশ কোথাও কিছু দেখিনি—তবে, মনে হয়, মতৈক্য নয়—বিষয়ের গুরুত্ব (merit of the issue) বিবেচনার ভিত্তিতে সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয়। পরে, যেমন Science পত্রিকায় হ'য়ে থাকে, চিঠিপত্র বিভাগে যে-কেউ মতপার্থক্যের কথা সরাসরি জানতে ও লিখতে পারেন। তাই প্রস্তাব, সমকালীন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর যে কোনো ব্যক্তির লেখা কোনো সুচিন্তিত মন্তব্যই আমরা 'সম্পাদকীয়' হিসেবে পরিবেশন করতে পারি।

(খ) পত্রিকার দ্বিভাষা-স্তরে প্রত্যাবর্তন: সুদূর ভবিষ্যতে পত্রিকাটিকে সর্বভারতীয় চরিত্র দেবার জন্যেই পত্রিকাটির দ্বি-ভাষার ভিত্তি প্রথম থেকেই গ্রহণ করা হয়েছিল। মূল ইংরেজি প্রবন্ধ বা সংবাদের বাংলা সারসংক্ষেপ আর বাংলায় লেখা মূল প্রবন্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলোর সংক্ষেপিত ইংরেজি সারাংশ রাখা হ'ত। আর, যেহেতু সারা ভারতের বিজ্ঞানকর্মীদের সংঘবদ্ধ করার কাজটি সচেতন প্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত ছিল তখন সবার, তাই এর ব্যতিক্রম ঘটানোর কথা কারুর মাথায়ই আসেনি। কিন্তু হঠাৎ-একটা-সময়ে কে-বা-কারা এসব বাহুল্য ভেবে বর্জন করতে শুরু করলেন তা জানিনা—কারণ, সে সময়টায় মূলত ব্যক্তিগত অসুস্থতা ও পরিবেশগত অন্য কয়েকটি কারণে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র সঙ্গে আমার সম্পর্ক পত্রিকার গ্রাহক-হওয়া-আর-পত্রিকা-পাওয়ার স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু, খুব সনিষ্ঠ ও গাঢ়ভাবে চাইবো: পত্রিকাটি বাঁচলে যেন তার অন্তর্বস্তুগত এ দুটি অপহৃত দিক তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় আগের মতই সসম্মানে।

পত্রিকাটি বেঁচে থাকবে ও বিকশিত হবে, এরকম একটা ইতিবাচক বিশ্বাস ছাড়া এরকম দীর্ঘ লেখায় হাত দেওয়া সম্ভব হ'ত না। শুধু পত্রিকা নয়, উৎস সংগঠনটি সম্পর্কেও একই "আশার ডানায় ভর দিয়ে" প্রস্তাবাকারে কয়েকটি কথা উপস্থাপনা করতে চাই (1) 'বি-ও-বি'-তে এ যাবৎ প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও প্রবন্ধধর্মী ছোট ফিচারগুলোর একটা সংকলন গ্রন্থ, সম্ভব হ'লে, প্রকাশ করার চেষ্টা করা অর্থবহ কাজ

হবে মনে হয় আমার। (2) তাছাড়া, আমাদের প্রকাশিত আগে যে পুস্তিকা-গুলো জনপ্রিয় হ'য়েছিল সেগুলোর পুনর্মুদ্রণের চেষ্টা করাও খুব সঠিক ও সময়োচিত কাজ হবে—একটু ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকে নজর রেখেই কথাটা এখানে বলা। অর্থাভাবের ব্যাপারটা সাময়িক হ'লে আপাতত মেটানোর সামান্য চেষ্টা করা যায়; কিন্তু ক্রনিক ডেফিসিট হয়ে দাঁড়ালে অবশ্য বিষয়টা নিয়ে অন্যভাবে ভাবতে হয়। আর, পত্রিকার বিষয়বস্তু-গত ক্ষেত্রে, আবার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার পুনরানয়ন ছাড়া, যা বলার কথা তা হ'ল: ক) বছরে অন্তত দু'টি বা তিনটি ইণ্টারভিউ প্রকাশের চেষ্টা করা—বিজ্ঞানের বর্তমান পরিস্থিতি, বিজ্ঞাননীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ বিষয়ক বা কোনো নির্দিষ্ট বিষয় অবলম্বন ক'রে বা দুটিকে সব সময়ই মেশানোর চেষ্টা ক'রে লেখাটি হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর, প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ করাটাই হবে সব দিক থেকে অর্থ-পূর্ণ; খ) বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম অগ্রগতির সংবাদের টুকিটাকি খবরের জন্য একটি বিভাগ রীতিমত চালাতে পারলে মানুষের আগ্রহ বাড়তে পারে পত্রিকা বিষয়ে। গ) বিশ্বজোড়া বিজ্ঞানকর্মী আন্দোলনের উৎসাহব্যঞ্জক নানা খবর পরিবেশনের জন্য একটা বিভাগ প্রত্যেক সংখ্যায় থাকলে পত্রিকার মান উন্নত হবে। ঘ) বিজ্ঞানের নতুন নতুন গ্রন্থ—বিশেষ ক'রে সিরিয়াস ধরনের বইপত্রের সমালোচনার একটা বিভাগ যুক্ত হ'লে পত্রিকার শ্রী ও গাম্ভীর্য দুই-ই বাড়বে। ঙ) বিজ্ঞানীদের জীবন ও মত প্রতিষ্ঠায় সমাজের সাথে বা সতীর্থ বিজ্ঞানীদের সাথে বিজ্ঞানীদের আদর্শগত সংঘাতের ক্রম-ইতিহাসগত ব্যাপারটা সঠিক ভাবে সময় সময় পরিবেশন করতে পারলে বিজ্ঞানের দর্শন ও বিজ্ঞানের সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কে আলোকপাত হয়। এরকম আমন্ত্রিত লেখা ছাপাতে পারলে ফল ভালো হবে আশা করা যায়। চ) আর, সব শেষে বলতেই হয় যে মুদ্রিত অক্ষরে পত্রিকায় ফচকেমি করা 'চলবে না'—একটা মাত্রাবোধ থাকা অতি-আবশ্যিক। পত্রিকার ভাবমূর্তি অক্ষত রাখবার চেষ্টা করতেই হবে।

প্রস্তাবিত এ আঙ্গিকগত পরিবর্তনসমূহটাই চূড়ান্ত কথা নয়—সে তো গেল মূলত পত্রিকা-কেন্দ্রিকতা। কিন্তু পত্রিকাটি তো একটি সংগঠনের ভাব-বিনিময়-মাধ্যম। আর সবার ওপর সত্য হ'ল এই সংগঠনের সংহতি ও অস্তিত্ব। সীমিত সাধ্য ও সঙ্গতি নিয়ে হলেও এখনই যতটা সম্ভব, বিজ্ঞানকর্মীদের সংগঠিত করার কাজে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে স্থির থাকাটাই হবে আমাদের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই অনেকটা বিস্মৃত অবহেলিত দিকটিকে পুনঃস্মরণ আজ আবশ্যিক কর্তব্য। □

With Best Wishes from :

TAPAN KUMAR BANERJEE

FOR

Mahakal Co-Operative Labour-Contract

&

Construction Society Ltd.

বি-ও-বি'র বন্ধুদের প্রতি

যথেষ্ট সুখপাঠ্য আর সহজবোধ্য না হলেও "বিজ্ঞান-ও-বিজ্ঞানকর্মী"র প্রকাশনা চালু থাকা দরকার। এর প্রয়োজন রয়েছে। গত দশ বছরে বি-ও-বি'র বিকল্প কোন পত্রিকা বা প্রচারমাধ্যম আমার চোখে পড়েনি, তাই এর দরকার।

মতামত এই কটা লাইনেই দেওয়া যায়, কিন্তু যেহেতু মতামতের দৈর্ঘ্য নিয়ে কোন রুলিং জারি করা নেই সেহেতু অপারচুনিটি নিচ্ছি বাড়তি-বকার।

'বি-ও-বি' ঠিক কাদের জন্য পত্রিকা, এটা আমি স্পষ্ট করে বুঝে উঠতে পারি নি এখনো। এই বাংলায় গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে 'বি-ও-বি'র আত্মীয়তা প্রশ্নাতীত। এখন, গণ-বা জনবিজ্ঞান তো মূলতই 'সাধারণ জন'কে নিয়ে ; এই সাধারণ জন বা সাধারণ পাঠক বলতে আমরা যা বুঝি তাদের কাছে কিন্তু এখনো 'বি-ও-বি'র পৃষ্ঠাগুলো আত্মীয়তার স্পর্শ এনে দেয় না। "এখনো" বললাম এই জন্য যে গত কয়েক বছর ধরে পত্রিকার আঙ্গিক, বিষয়বিন্যাস পরিবর্তিত চেহারা পাচ্ছে দেখছি, কিন্তু লেখার ধরন, সারবস্তু, ভাষা—সবই যেন সেই আগের মতই উঁচু তারে বাঁধা—টান টান, কেতাবী, elitist ; বোধহয় বোতল পাল্টেছে মদ পাল্টায়নি (এ 'মদ' বলতে নেশাগ্রস্ত করে রাখার বিষরস mean করছি না, ভুল বুঝবেন না, বরং এ মদ পরিণত বুদ্ধি আর জ্ঞান-গাম্ভীর্যের মাদকরস বোধহয়, যা লেখককে নিজের elitist চেতনায় আচ্ছন্ন করে রাখে—"সাধারণ পাঠকের জন্য" চিন্তাটা আর কাজ করে না)। যদি এটা সত্যি হয় তাহলে 'বি-ও-বি'র বিচরণক্ষেত্র ঠিক করে নিতে হবে। অল্পসংখ্যায় ছাপিয়ে কলেজ-ইউনিভার্সিটি-সংগঠকদের মধ্যে বিতরণের দিকে জোর না দিয়ে stall গুলোতে মনোযোগ দিলে পণ্ডশ্রম হবে না তো ? Stall-এ পত্রিকা মোটামুটিভাবেও গৃহীত না হলে আরেকটা হতাশার দিক উন্মোচিত হবে না তো ? ...ঘুরে ফিরে কর্মীসংকটের কথাই এসে যাবে, সে সমস্যার মোকাবিলার বিষয়ে আমার কোন কিছুই বলার ক্ষমতা নেই। কেবল মনে হয়, 'বি-ও-বি'কে জনপ্রিয় করার যে চেষ্টা গত কয়েক বছরে দেখেছি (যদি আমার ভুল না হয়) সেটা কিছু ফলপ্রসূ হয় যদি অভিজ্ঞতাভিত্তিক লেখা বা লেখায় অভিজ্ঞতার উদাহরণ বেশী মাত্রায় থাকে। আমার ধারণায় এ পর্যন্ত 'বি-ও-বি'র অভিজ্ঞতা-সংপৃক্ত লেখাগুলোই দাগ কেটেছে বেশী।

সবশেষে, পত্রিকা পরিচালনার policy আমি পত্রিকার চরিত্র থেকে ধরতে পারি নি, আজও। যে-কোন লেখা, যে-কোন চিঠিই কি 'বি-ও-বি' ছাপবে ? ছাপলে, তা কি সঙ্গত হবে ? বি ও বি'র পাতায় দুই বিদগ্ধ পত্রলেখকের ego'র দ্বন্দ্বকে কি পত্রিকা মদত দেবে ? কিংবা কোন obsessed পত্রলেখকের ক্রোধ-অভিমান প্রকাশের মাধ্যম কি 'বি-ও-বি' হবে ? বেশ কয়েকবছর মনোযোগ দিয়েও আমি নিজের মধ্যে উত্তর খুঁজে নিতে পারি নি। তাই প্রশ্নগুলো প্রশ্ন হিসেবেই রাখলাম।...বিশেষ করে গত সংখ্যায়, 'উৎস মানুষ'-এর প্রতি (নাম না থাকলেও নিয়মিত পাঠক হিসেবে আমার বুঝতে অসুবিধা হয় নি) ক্ষুব্ধ বিরক্ত এক পাঠকের চিঠি বি-ও-বি'র পাতায় দেখে বিস্মিত হয়েছি। পরিচালকমন্ডলী চিঠিটা প্রকাশের আগে কি যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে ভেবেছিলেন ? "অবদমন" বা "কন্ডিশনিং" কি অতই সহজে আসে ? পত্রলেখকের অন্য কোন অভিসন্ধি চরিতার্থের সম্ভাবনার কথা কি ভেবেছিলেন ?

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় □

With best compliments from :

M/s Gautam Adhikary
Kachharipatty, Bolepur
Birbhum

With best compliments from :

Debasis Ghosh
Pravat Sarani, Bolepur,
Birbhum

গণবিজ্ঞান আন্দোলন ও 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'

কিছু ব্যক্তিগত কথা

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' সম্পর্কে কিছু বলার আগে ব্যক্তিগতভাবে কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই। পত্রিকা প্রকাশনা সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তা যখন ভ্রূণাবস্থায় ছিল তখন থেকে শুরু করে মাত্র দু'বছর পর্যন্ত আমি এর সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলাম। পরে বি-ও-বি'র সাথে সম্পর্ক ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে 1980 নাগাদ এমনকি নিয়মিত পাঠক হিসেবেও আমার যোগাযোগ প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছায়। রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে এসপার-ওসপার লড়াই, বৃহত্তর রাজনীতিক প্রশ্নে চূড়ান্ত বিভ্রান্তি, identity crisis, প্রথাগত মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদী এবং যুক্তিবাদী আত্মক্ষয়ী বিদ্রোহ ইত্যাদি মিলিয়ে (গণ) বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রশ্ন নিয়ে ভাবার বিশেষ অবকাশ ছিল না বা এ নিয়ে চিন্তা করার মানসিক তাগিদ অনুভব করিনি। এরপর 1983 থেকে পশ্চিমবাংলার বাইরে থেকে এবং বিভিন্ন কারণে পশ্চিমবাংলার সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখতে পারিনি। 'বি-ও-বি' পত্রিকা নিয়মিতভাবে পেতে শুরু করেছি মাত্র বছর দুয়েক ধরে। এরকম অবস্থায় 'বি-ও-বি' সম্পর্কে সৃজনশীল সমালোচনা করা বা সাদা-মাটা কথায় 'কি হলে ভাল ভাবে হতো' ধরনের প্রস্তাব রাখতে যাওয়াটা বেমানান ঠেকলেও ঠেকতে পারে।

তবুও দু'কথা লিখতে প্রবৃত্ত হলাম—একটা কথা ভেবে। শুরু থেকে যুক্ত থাকা এবং পরে 'দূর থেকে দেখার' সুযোগ আমার হয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে দু'চার কথা 'বি-ও-বি'র কাজে লাগলেও লাগতে পারে হয়তো।

ব্যক্তিগত মতামত রাখার আগে, শুরুতে 'বি-ও-বি' কি ছিল সে সম্পর্কে সংক্ষেপে ইতিহাস-চারণা প্রয়োজন ব'লে মনে করি। এতে তখনকার 'বি-ও-বি' কি ছিল এবং এখনকার 'বি-ও-বি'র সাংগঠনিক এবং চিন্তা-ভাবনাগত পরিবর্তন কিছুটা স্পষ্ট হবে।

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' : পেছনের দিকে তাকিয়ে

'বি-ও-বি'র জন্ম খুব যে আশা-উদ্দীপনাভরা সময়ে হয় নি তা হয়তো সবাই জানেন। '75-এর আগেই 'মুক্তির দশক' স্বপ্ন প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। জরুরী কালীন পক্ষাঘাত অবস্থা, সমাজবিপ্লবের প্রশ্নে দিশাহীনতা ইত্যাদির মধ্যেও সবাই মিলে যে বিষয়ে একান্ত তাগিদ অনুভব করছিলাম তা হ'ল এমন একটি কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যেখানে দলীয় সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির চর্চা করা যায়। এর বাস্তব প্রেক্ষাপট হিসেবে (খুব চোখে পড়ার মত না হলেও) কয়েক বছর আগে 'দলমত নির্বিশেষে' অনেকটা এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত উদ্যোগ নিয়েছিল কয়েকটি কলেজের র‍্যাডিকাল ছাত্রদের একটি অংশ, যেমন প্রেসিডেন্সী কলেজ, মেডিকেল কলেজগুলো, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তখন—বিশেষ করে কয়েকটি কলেজে ম্যানেজিং কমিটির গণতন্ত্রীকরণের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে এবং WBCUTA'র * মধ্যেকার স্থিতাবস্থার সমর্থক নেতৃত্ব এবং আমলা-তান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে 'WBCUTA বাঁচাও' pressure group তৈরী হয়েছে। এই সামগ্রিক পরিবেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার এবং তার মুখপত্র হিসেবে 'বি-ও-বি'র জন্ম। বিজ্ঞানকর্মী সংগঠনের প্রশ্ন এবং প্রয়োজনীয়তা মূলতঃ দু'টি কারণে এসেছিল : এক, সাহা ইনস্টিটিউট, বোস ইনস্টিটিউট, ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স-এর গবেষক ও কর্মচারীদের ম্যানেজমেন্ট বিরোধী আন্দোলন, এবং দুই, ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণার সামাজিক ভূমিকা এবং বিজ্ঞানীদের সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রশ্নে। 'বিজ্ঞানকর্মী' শব্দটির ব্যবহার কোনো সমাজ-অর্থনীতির কাঠামোগত বিচার-বিবেচনা থেকে উদ্ভূত হয়নি ; নামটা প্রায় হাতে পাওয়া—Bulletin of Association of the Scientfic Workers of India বা সংক্ষেপে BASWI থেকে। সংগঠনের নামটাও ASWI-এর আদলে রাখা হয়েছিল। যদিও 'বিজ্ঞানকর্মী' বলতে অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস থেকে শুরু করে প্রকৃতিবিজ্ঞানের শিক্ষণ বা গবেষণার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত সবাইকে বোঝানো হোত। সংগঠনের মূল্য উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞানকর্মীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সংগঠিত করার সাথে সাথে আলোচনা এবং বিতর্কের মাধ্যমে তাঁদেরকে রাজনীতিক ও সামাজিক প্রশ্নে সচেতন করা এবং বৃহত্তর সমাজ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে উৎসাহিত করা।

পত্রিকা হিসেবে 'বি-ও-বি'র অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল (কল্পিত বলাই ভাল)—'সমাজ-অর্থনীতিক ব্যবস্থা নিরপেক্ষভাবে' বিজ্ঞানের যে ভাবমূর্তি (ideal) রয়েছে তাকে তত্ত্বগতভাবে 'চ্যালেঞ্জ' করা, বিজ্ঞানের সামাজিক এবং রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে বিতর্ক গড়ে তোলা এবং 'স্বয়ম্ভর জাতীয় অর্থনীতির প্রশ্নে' (আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা তখনো 'জাতীয়' সীমা অতিক্রম করেনি), বিজ্ঞানশিক্ষা এবং গবেষণা সংক্রান্ত নীতি সম্পর্কে বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত ঐকমত্য গড়া। বলা বাহুল্য বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার ঘোষিত (এবং অঘোষিত) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাংগঠনিক কাজকর্ম বা পত্রিকার মাধ্যমে উল্লেখনীয় ভাবে

* প : বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

মূর্ত হয়ে উঠতে পারেনি। কিছুদিনের মধ্যে JACARI গড়ে উঠলে পর সক্রিয় অধিকাংশ বিজ্ঞানকর্মীদের এই সংস্থায় যথেষ্ট সময় দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই সংগঠনের সাময়িক উদ্যোগে ভাঁটা পড়তে শুরু করে। টিকে থাকে শুধু 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকা—জনা কয়েক 'নাছোড়বান্দা'র পাল্লায় পড়ে!

গণবিজ্ঞান আন্দোলনের অমীমাংসিত প্রশ্ন

যে সময়ের কথা বলছি তখন গণবিজ্ঞান আন্দোলনের প্রশ্নটি কানে ঢোকার মত সাড়া ফেলেনি। কেরল শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ (KSSP)-এর কাজকর্ম সম্পর্কে আমরা মোটামুটি অবহিত ছিলাম। তবে, সামাজিকভাবে এর তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা বা আরো বেশী করে জানার ব্যাপার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করিনি। মোটামুটিভাবে সবাইকার মধ্যে এ ধরনের একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা ছিল: কেরলের প্রায়-মধ্যশ্রেণীভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, তুলনামূলক ভাবে কম জনসংখ্যা, আধুনিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, মধ্য এশিয়ার তেলের দেশ অভিমুখী জনস্রোত এবং তজ্জনিত অর্থের সমাগম, টিউটোরিয়াল হোমের মত গজিয়ে ওঠা অসংখ্য (প্রাইভেট) টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট মিলিয়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যেখানে গ্রামে গ্রামে বিজ্ঞান ক্লাব ও বিজ্ঞান পত্রিকার চাহিদা হওয়া শুধু সম্ভবই নয়—স্বাভাবিকও বটে। অবশ্য আমাদের আত্মগত ব্যাখ্যা ছাড়াও তখন পর্যন্ত KSSP'-র কর্মকান্ড গণবিজ্ঞান আন্দোলনের চরিত্র অর্জন করেনি একথা সত্য; একটা বিশাল পরিসরে অনেকটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় এর কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল বলা চলে।

> "একদিকে ভারতের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান আমলা-তান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যদিকে বিদেশ থেকে উচ্চ কারিগরী আমদানির উদারনীতি এমন এক বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করেছে যা বিজ্ঞান গবেষণাকে উদ্দেশ্যহীন, অপ্রোয়জনীয়, ritualistic কার্যকলাপে পরিণত করছে। বিজ্ঞানী সম্প্রদায় ক্রমশ এক ধরনের বেতনভোগী কর্মচারীতে পরিণত হচ্ছেন।"

'গণবিজ্ঞান আন্দোলন' কথাটা চালু হতে শুরু করে (যত দূর মনে পড়ছে) 1980 থেকে। এবারের পটভূমি মহারাষ্ট্র। বিজ্ঞানকে ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন (এবং বিচ্ছিন্ন) প্রয়াস শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হয় অনুরূপ প্রয়াস। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, 1980-এর পর থেকে বিজ্ঞানকে জনমুখী করার জন্য একটা আবহাওয়া গড়ে ওঠে যা আপাতদৃষ্টিতে 'Voluntarist' বলে মনে হয়। কারণ গণবিজ্ঞানের উত্থানের পেছনে ক্রিয়াশীল সমাজ-আর্থনীতি-ভিত্তিক পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রক দিকগুলি, তাদের সম্পর্ক, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শ্রেণীগত অবস্থান বিচারে এর ভূমিকা এখনও স্পষ্ট নয়। যাই হোক, চিপকো আন্দোলন, সাইলেন্ট ভ্যালি বিতর্ক, ভূপালের রাসায়নিক ধ্বংসকান্ড, এইডস-বায়োটেকনলজি বিতর্ক, চের্নোবিল, লুধিয়ানা এয়ারোস্পেস কারখানার কর্মীদের বিকল্প শিল্পোদ্যোগের পরিকল্পনার আংশিক সাফল্য, ইকোলজি, পরিবেশ দূষণ, বায়োটেকনলজি-নিউক্লিয়ার সহ অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি,

> "ডিসেম্বর 1971 সালে ফিলাডেলফিয়াতে আয়োজিত American Association for the Advancement of Science সংক্ষেপে AAAS-এর বার্ষিক অধিবেশনে মাত্র 15 জন সদস্য নিয়ে গঠিত SESPA প্রায় Commando Action কায়দায় হঠাৎ করে অধিবেশনের মধ্যে ঢুকে ভিয়েৎনাম যুদ্ধবিরোধী প্রচারপত্র ছড়িয়ে আত্মপ্রকাশ করে। (উপস্থিত বিজ্ঞানীরা ক্ষিপ্ত হয়ে বির্তক নয়, গায়ের জোরে তাদের বার করে দিয়েছিলেন।) এরপর প্রায় সাত বছর ধরে 'Science for the People.' বিজ্ঞানী মহলে অজস্র প্রচারপত্র ছড়িয়ে, এলিট বিজ্ঞানীদের নীতি এবং মতাদর্শের বিরুদ্ধে AAASএর বিভিন্ন অধিবেশনে বিরামহীন প্রতিবাদ আন্দোলন করেছে, আলোচনা সভা করেছে। হাইড্রোজেন বোমার জনক Edward Teller-কে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান "Science inthe Service of Warmakers"-এর স্বীকৃতি হিসাবে "Dr. Strangle Love" পুরস্কার দিয়ে মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।"

ইত্যাদি বিষয়—আজ গণবিজ্ঞান আন্দোলনকে একদিকে যেমন জাতীয় (ভৌগোলিক) সীমারেখার বাইরে নিয়ে গেছে অন্যদিকে তেমনি এমন কিছু মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি করতে বাধ্য করেছে যা আগে নেহাতই বিমূর্ত স্তরে ছিল। সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্ন হল সেই পুরাতন অমীমাংসিত প্রশ্ন—গণবিজ্ঞান আন্দোলন বলতে কি বোঝায়? আন্দোলনের লক্ষ্য ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর বাস্তব রূপ এবং ভূমিকা কি হওয়া উচিত? গণবিজ্ঞান আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং প্রয়াস কি শুধু জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক / যুক্তিবাদী মানসিকতা তৈরী করা? বিজ্ঞানের অমানবিক প্রয়োগ সম্পর্কে জনমত গড়ে তোলা, নাকি—মানবমুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সমাজ-আর্থনীতিক রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটাতে যে সমস্ত প্রধান সামাজিক শক্তি সংগ্রামরত তাদের সাথে এবং স্বার্থে বিজ্ঞানের মানবিকতাবাদী সৃজনশীলতাকে যুক্ত করা? বলা নিষ্প্রয়োজন—এর কোনোটাই পরস্পরবিরোধী নয়। বরং একে অন্যের পরিপূরক। কিন্তু মুস্কিলটা হ'ল অন্য জায়গায়। কোনো আন্দোলনই অরাজনৈতিক নয়। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের মধ্যে

স্পষ্টভাবে উচ্চারিত না হলেও কিছু political presumption থাকতে বাধ্য। এবং তা একদিকে আমাদের সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রচরিত্র বিষয়ে, অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে।

পারমাণবিক দুর্ঘটনা, পরিবেশের ক্রমাবনতি, ইকোলজির ভারসাম্য বিনষ্টি ইত্যাদির ভয়াবহ সম্ভাবনা দেখে অনেকে আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদন শক্তির (productive forces) অন্তর্নিহিত ধ্বংসাত্মক চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন। তর্ক তুলেছেন—আধুনিক বিজ্ঞানের 'অবজেক্টিভিটি'র বর্ম, কেন্দ্রমুখী (centralised) সাংগঠনিক কাঠামো ইত্যাদি একে অনিবার্যভাবে ধ্বংসাত্মক (violent) চরিত্র দান করেছে যা এক কথায় 'মানবমুক্তি বিরোধী' বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এর বিপরীত ধারা হল—প্রথম ধারার যুক্তিকে 'দাও ফিরে সে অরণ্য' হিসেবে বিবেচনা করা। বিজ্ঞানকে 'মুক্তিদাতার' আসনে বসিয়ে এই দ্বিতীয় ধারার সমর্থকরা শিল্পোদ্যোগের বল্গাহীন প্রসার ও বৃদ্ধির সপক্ষে সওয়াল করছেন। ভারত সরকারের বহু অযৌক্তিক উন্নয়ন (!) উদ্যোগকে সমর্থন করছেন। এমনকি সরকারের নিউক্লিয়ার নীতির প্রতিও শর্তহীন সমর্থন জানাচ্ছেন, আর 'নিউক্লিয়ার বোমা' প্রসঙ্গে মৌন থাকা শ্রেয় মনে করছেন। এই ধারাটি আরো বেশী জোরদার হয় যদি এর প্রবক্তারা বিশ্বাস করেন—ভারতীয় সমাজ আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী হলেও সামন্তবাদের অবশেষ জর্জরিত ; তাই উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ চাই প্রযুক্তির অগ্রগতি—চাই ভারি-উদ্যোগীকরণ ! তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদ তো রয়েছেই, যার বিরুদ্ধে সংগ্রামে 'প্রগতিশীল জাতীয় বুর্জোয়াদের' সঙ্গে নিয়ে লড়তে হবে। এই যুক্তির অনিবার্য পরিণতি : উচ্চ কারিগরী, ভারি উদ্যোগিক বিকাশ, সমরাস্ত্র তৈরী ইত্যাদি যাবতীয় বুর্জোয়া প্রকল্প, উদ্যোগ এবং দেশ-প্রেমিকতা-জাতীয়তাবাদের নামে (বুর্জোয়া) সমাজ-আর্থনীতিক নীতির প্রতি সমর্থন।

এর মানে এই নয় যে প্রথম ধারাটি (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিরোধী) সঠিক। প্রাক-ব্রিটিশ বর্ণ-ভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক ভারতীয় সমাজব্যবস্থা 'ইকোলজির ভারসাম্য রক্ষাকারী বিজ্ঞানের' জন্ম দিতে পারত—এ ধরনের কল্পনা ফ্যান্টাসীর নামান্তর।

আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উৎপাদন সম্পর্কের সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে যে David Collingridge এবং Colin Reeve এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছেন—"Science speaks to power"।—অর্থাৎ আজকের বিজ্ঞানের কাঠামোগত চরিত্র এবং শক্তি (power) এমনই যে এর থেকে উদ্ভূত তথ্য ও জ্ঞান একমাত্র রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের পক্ষেই ব্যবহারযোগ্য। এছাড়া অ্যাসিড বৃষ্টি, পেট্রলে সিসার পরিমাণ, বুদ্ধ্যাঙ্ক নির্ণয় পদ্ধতি, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সংক্রান্ত বিপদ ইত্যাদি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক বিজ্ঞান গবেষণার নিজস্ব ক্ষেত্রে প্রায় 'cottage industry'র জন্ম দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে সোভিয়েত রাশিয়ার ইকোলজি সম্পর্কে 'উদ্বেগ' এবং তৎসংক্রান্ত নীতি ও মোকাবিলার পদ্ধতির বিষয়টি—যেটা 'ecological industry' গড়ে তোলারই সমার্থক, এবং যাতে 'বৈজ্ঞানিকভাবে' ecomanagement এর কথা বলা হয়েছে।

গণবিজ্ঞান আন্দোলন ও পিপল্‌স পাওয়ার

'Science speaks to power'—এটা এমন এক বাস্তব সত্য যা অস্বীকার করা যায় না। আবার এর থেকে বিজ্ঞানের আরেকটি দিকও বেরিয়ে আসে : 'Science has the power to speak to power'। এই (social) power-এর প্রশ্ন এড়িয়ে গণবিজ্ঞান আন্দোলন সামাজিক-ভাবে সার্থক হতে পারে না। মানবসমাজের কাছে বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয়। কিন্তু এর মানবতাবাদী দিকগুলির বাস্তবীকরণ তখনই সম্ভব যদি মুক্তিকামী শ্রেণী বা peoples' power এর সাথে বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত জনকল্যাণমুখী ক্ষমতার সক্রিয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র তথ্য / সংবাদ বিতরণের মাধ্যমে সম্ভব নয়। 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর' তৎকালীন ধ্যান-ধারণা বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক খানি out-moded হলেও, আমি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি—গণবিজ্ঞান আন্দোলনের অভিমুখ কি হবে তা আমাদের বাস্তব সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের সমাজ-রাজনীতিক ভূমিকাকে প্রশ্ন না করে হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে ডি. ডি. কোসাম্বীর পারমাণবিক শক্তির বিরোধিতা স্মরণ করা যেতে পারে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বিপদ ছাড়াও মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ তাঁর বিরোধিতার ভিত্তি ছিল এর বিপুল সামাজিক মূল্য (social cost) এবং শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। তিনি বড় বড় বাঁধের বদলে ছোট বাঁধের সপক্ষে বলতে গিয়ে বলেছেন—এটা শুধুমাত্র কৃষি এবং শিল্পোদ্যোগের প্রশ্ন নয়—"but a direct road to socialism"।

এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আরেকটি প্রশ্ন যা আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। তা হল—সমাজ পরিবর্তনের প্রশ্নে গণবিজ্ঞানের নিজস্ব কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে পেশাগত বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞদের (যে ধারণা ভিন্ন উদ্দেশ্যে হলেও 'বি-ও-বি'র জন্মকাল থেকেই ছিল) 'সক্রিয়ভাব যুক্ত করা'। 'গণবিজ্ঞান আন্দোলন'কে আমি anti bureaucratic decentralised সমাজমুখী উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে পরিচালিত শ্রমজবী মানুষের আন্দোলনের একটি সাহায্যকারী এবং পরিপূরক ধারণা হিসেবে গণ্য করছি। একদিকে ভারতের বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যদিকে বিদেশ থেকে উচ্চ কারিগরী আম-

দানির উদারনীতি এমন এক বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করেছে যা বিজ্ঞান গবেষণাকে উদ্দেশ্যহীন, অপ্রয়োজনীয়, ritualistic কার্যকলাপে পরিণত করছে। বিজ্ঞানী সম্প্রদায় ক্রমশ এক ধরনের বেতনভোগী কর্মচারীতে পরিণত হচ্ছেন। এই দ্বন্দ্ব বাড়ছে এবং বাড়বেও। এবং অনুমান করা স্বাভাবিক, বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের মধ্যে সংবেদনশীল অংশ যাঁরা নিজেদের স্কিল এবং মেধাকে অর্থবহভাবে ব্যবহার করতে চান, তাঁরা নিশ্চয়ই বিকল্পের প্রশ্ন নিয়ে আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হবেন। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সাথে যুক্ত কর্মীরা বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের এই সংবেদনশীল অংশকে শ্রমজীবী শ্রেণীর আমলাতন্ত্র বিরোধী এবং সমাজমুখী বিকল্প-উৎপাদন পরিকল্পনা এবং অন্যান্য সমস্যার সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয় করাতে পারেন, অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারেন, এবং আন্দোলনের সাথে তাঁদেরকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে পারেন। বলা বাহুল্য, 'peoples power'-এর সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা কোনটাই রুটিনগত প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা বা বৈজ্ঞানিক অন্বেষার থেকে কম চ্যালেঞ্জের নয়।

এই প্রসঙ্গে (যদিও একটু আলাদা পরিপ্রেক্ষিতে) আমেরিকার Scientists and Engineers for Social and Political Action (সংক্ষেপে SESPA) স্থাপিত Science for the People (যা একসাথে পত্রিকা এবং র‍্যাডিকাল বিজ্ঞানীদের সংগঠনও বটে)-এর বিবর্তন উল্লেখ করা যেতে পারে।

ডিসেম্বর 1971 সালে ফিলাডেলফিয়াতে আয়োজিত American Association for the Advancement of Science সংক্ষেপে AAAS-এর বার্ষিক অধিবেশনে মাত্র 15 জন সদস্য নিয়ে গঠিত SESPA প্রায় 'Commando Action' কায়দায় হঠাৎ করে অধিবেশনের মধ্যে ঢুকে ভিয়েৎনাম যুদ্ধবিরোধী প্রচারপত্র ছড়িয়ে আত্মপ্রকাশ করে। (উপস্থিত বিজ্ঞানীরা ক্ষিপ্ত হয়ে বিতর্ক নয়, গায়ের জোরে তাদের বার করে দিয়েছিললেন !) এরপর প্রায় সাত বছর ধরে, Science for the People, বিজ্ঞানী মহলে অজস্র প্রচারপত্র ছড়িয়ে, এলিট বিজ্ঞানীদের নীতি এবং মতাদর্শের বিরুদ্ধে AAAS-এর বিভিন্ন অধিবেশনে বিরামহীন প্রতিবাদ আন্দোলন করেছে, আলোচনা সভা করেছে। হাইড্রোজেন বোমার জনক Edward Teller কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান "Science in the Service of Warmakers"-এর স্বীকৃতি হিসেবে "Dr Strangle Love"-পুরস্কার দিয়ে মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। —এইভাবে নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে মার্কিনী বিজ্ঞানী মহলে ইতিমধ্যে বেশ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। যার ফলশ্রুতি হিসাবে AAAS-কে—Political implication of Science & Technology শীর্ষক এক আলোচনাসভা করার জন্য SFTP কে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছে।—যা সংবাদপত্রে 'An unlikely turn of event' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই সমস্ত কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে ভারত বা পশ্চিমবাংলার গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সাথে যুক্ত পেশাগত বিজ্ঞানীদের SESPA বা SFTP-কে মডেল হিসেবে ধরে অনুরূপ কাজকর্ম করতে হবে। বলার উদ্দেশ্য শুধু এই যে SFTP-র কার্যকর পদক্ষেপের ফলশ্রুতি হিসাবে এই সংগঠন আমেরিকার বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের সাথে সামাজিক প্রশ্নে অর্থবহ আলোচনা করার মত যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছে তার থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে। Natural Science Academy, Indian Science Congress···এগুলিকে এলিটিস্ট', 'সরকারের ধামাধরা সংস্থা' আখ্যা দিয়ে বিচ্ছিন্ন থাকায় এক ধরনের 'আত্মপ্রসাদ' দিতে পারে কিন্তু তার সাথে 'হাটুরে বিজ্ঞানবক্তা' বা 'Scientific quack' হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায় যা ভবিষ্যৎ গণবিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রবণতার জন্ম দিতে পারে।

অনেকে মনে করতে পারেন আমেরিকার বিজ্ঞানী সম্প্রদায়কে বিজ্ঞানের রাজনৈতিক এবং সামাজিক আন্তঃসম্পর্কে বিষয়ে সজাগ করে তোলা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন এবং প্রত্যক্ষ আগ্রাসী চরিত্রের কারণেই তুলনামূলকভাবে সহজতর এবং এই সমস্ত প্রশ্নে মার্কিন বিজ্ঞানীরা সাড়া দিতে পেরেছেন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তুলনায় তাঁরা অনেক বেশী 'র‍্যাডিক্যাল' এবং 'মুক্তমনা' বলেই। আমি ব্যাক্তিগতভাবে মনে করি এই ধরনের অনুমান করার মত কোন বাস্তব তথ্য-ভিত্তি নেই। যে সমাজে রেগনের মত একজন 'International Out-law' দু-দুবার প্রেসিডেন্ট পদে বিপুল ভোটে আসীন হতে পেরেছে, সে সমাজের সাধারণ জন-মানসিকতা থেকে বিজ্ঞানীরা ব্যতিক্রম রয়ে গেছেন এ ধরনের সিদ্ধান্ত করার যুক্তিগ্রাহ্য কোনো কারণ নেই। দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Industrial Military Complex-এর সাথে বিজ্ঞান গবেষণা এমন ওতপ্রোতভাবে যুক্ত যে স্বাধীন বিজ্ঞান গবেষণার সুযোগ এবং মানসিকতা মারাত্মকভাবে সীমিত। এ ছাড়াও, এখন পর্যন্ত আমেরিকার ব্যাপকতম জনমানসে এমনকি 'সমাজবাদ' শব্দটিও 'গণতন্ত্র বিরোধিতার' সমার্থক এবং বিজ্ঞানীরাও এই সংস্কার থেকে মুক্ত নন।

মার্কিন সমাজের বর্তমান অবস্থায় কমিউনিটি বোধের বড়ই অভাব বা প্রায় অনুপস্থিত। সে তুলনায় ভারতীয় সমাজ এবং রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যে যে বিজ্ঞানী সম্প্রদায় পেশাগতভাবে যুক্ত রয়েছেন তাঁরা আমাদের সমাজব্যবস্থার বিশেষ চরিত্রগত কারণে মানসিকতার দিক থেকে (আপেক্ষিকভাবে) বেশী সমাজ-সচেতন হবেন এটাই স্বাভাবিক। টাটা-বিড়লার মত একচেটিয়া কারবারী থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পুরাতন সমাজ সম্পর্ক এখনো যে থেকে গেছে শুধু তাই নয়, আপাতদৃষ্টিতে এই স্থায়িত্ব বিস্ময়ে উদ্রেক করে। সাময়িক সমাজ-জীবনে

শিল্পোদ্যোগের দ্রুত প্রসার, দেশীয় আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মে কৃষির অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা —এ সমস্ত মিলে ভারতীয় বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের গঠন এবং চরিত্র অনেক জটিল এবং বিচিত্র। তাই সমাজ-রাজনীতিক প্রশ্নে বিজ্ঞানীদের মধ্যে পোলোরাইজেশন হওয়ার সম্ভাবনা একদিকে যেমন অনেক বেশী অন্যদিকে তেমনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ঘিরে আজকে যে সমস্ত বহুমুখী প্রশ্ন উঠেছে তাতে তাঁদেরকে (বিভিন্ন সামাজিক এবং শ্রেণী অবস্থান থেকে আসার ফলে) সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার মত বাস্তব অবস্থাও রয়েছে। এই মর্মে একটি সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকর পন্থা বার করা গণবিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যতম কাজ হওয়া উচিত বলে মনে করি।

পত্রিকা সম্পর্কে গুটিকয়েক কথা

গণবিজ্ঞান আন্দোলন চরিত্রগতভাবে এবং সময়ের মাপকাঠিতে একটি নতুন এবং সাম্প্রতিক আন্দোলন। এর সমাজ-রাজনীতিক তাৎপর্য এবং ভূমিকাকে নিয়ে প্রশ্ন এবং আলোচনা শুরু হয়েছে মাত্র। তাই আরো কিছু বলার থাকলেও পত্রিকার সীমিত পরিসরের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখছি।

শেষ করার আগে 'বি-ও-বি সম্পর্কে কয়েকটি কথা এবং কিছু পরামর্শ রাখার প্রয়োজন বোধ করছি। বাজারী ফর্দের মত এক-দুই করেই বলি—

1. সমালোচনার নামে মাঝে মাঝে যে সব কুৎসিত ব্যক্তিগত পান্ডিত্য প্রদর্শনের লড়াই হতে দেখা গেছে এবং সম্পাদকমণ্ডলী এতে যে চরম উদারবাদী অবস্থান নিয়েছেন—এই ঝোঁকটি যেন অচিরেই বন্ধ হয়।

2. কোনো একটি বিশেষ বিষয়কে (যেমন, whether technology is value-free) কেন্দ্র করে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সম্যক আলোচনা করা। (বিষয় সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে মতামত অবহ্বান করা যেতে পারে।)

3. বর্তমান কৃষি ব্যবস্থার (ভারতবর্ষের বাস্তব পরিস্থিতিতে) সাথে জড়িত ইকোলজি এবং সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সমস্যাকে তথ্য ও সার্ভের ভিত্তিতে তুলে ধরা।

4. আধুনিক পুঁজিবাদ বহু নতুন নতুন দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছে যার ফলশ্রুতিতে দেখা দিয়েছে নতুন ধরনের শ্রেণীগত আন্দোলন যেমন, ইকোলজি, পরিবেশ, প্রযুক্তি বিরোধী আন্দোলন সমূহ। এই আন্দোলনকে পুঁজিবাদী সম্পর্কের ঘেরাটোপে সীমাবদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োগও সুস্পষ্ট। এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানকেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে মতামত গড়ে তোলায় উদ্দ্যোগী হতে হবে 'বি ও-বি'কে এবং এই দ্বন্দ্বসমূহ মীমাংসার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ভূমিকা কি হতে পারে সে সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার সূত্রপাত করতে পারে বি-ও-বি'।

5. বায়োটেকনলজির বিভিন্ন দিক এবং গোটা পৃথিবীর ইকোলজির উপর এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করা প্রয়োজন।

6. শিকারী-যাযাবর স্তর থেকে কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব এবং ধারণার বিরুদ্ধে বহু র‍্যাডিক্যাল প্রশ্ন সাম্প্রতিক সমাজ-নৃতাত্ত্বিক গবেষণার আলোকে সামনে আসছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

7. বিকল্প প্রযুক্তি কথাটা আজকাল বেশ চালু দেখা যাচ্ছে। যদিও এর অর্থ, এর সাথে সমাজ-আর্থনীতিক সম্পর্ক এবং চলতি শাসন কাঠামোয় এর সম্ভাব্যতা নিয়ে বিশেষ কোনো আলোচনা ও বিশ্লেষণ চোখে পড়ে না। এ নিয়ে ভাবনা শুরু করা যেতে পারে।

সবশেষে

পরিশেষে পত্রিকার গুণগত মান সম্পর্কে অতুচ্ছ্বাস প্রকাশ না করেও বলি অতি অল্প সময়ের মধ্যে 'বি-ও বি' তার অতি সীমিত শক্তি সত্ত্বেও গণবিজ্ঞান আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয়কে জনপ্রিয়ভাবে পরিবেশনের কাজটা মোটামুটি সার্থকভাবে করতে পেরেছে বলে মনে করি।

'বি-ও-বি', 'উৎস মানুষ' এবং গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সাথে যুক্ত আরো কিছু পত্রিকা জটিল বিষয়কে সরল, আকর্ষক এবং জনগ্রাহীভাবে উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে নতুন এক লেখনশৈলী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে যা এমনকি পাঁচ বছর আগেও ছিল না।

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'কে ঘিরে আশা-প্রত্যাশা হয়তো বাস্তব অবস্থার পটভূমিতে মাত্রাতিরিক্তভাবে করে ফেলেছি। আজকের সমাজ এবং শ্রেণী আন্দোলনের ক্ষেত্রে চরম হতাশা ও বিভ্রান্তি এমন এক শ্বাসরোধী অবস্থার সৃষ্টি করেছে যেখানে অতি সীমিত ক্ষেত্রে সামান্যতম সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতেও মানসিক শক্তি এবং উদ্যম ফুরিয়ে যায়। অনুভব করতে পারি 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র মত একটি পত্রিকা নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে এর সাথে যুক্ত বন্ধুদের কি ধরনের পর্যায় 'fanatic zeal' নিয়ে চলতে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে 'Frontier' (যা 'বি-ও-বি'র থেকে বয়সে দশ বছরের বড়) বিশ বছরে পা দেওয়ার উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যাতে (মে '87) আত্মকথনের উপসংহারে লিখিত লাইন কটি ঘুরে ফিরে মাথায় আসছে—"It is a terribly difficult and confusing situation for a radical journal but we hope to carry on"। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর ক্ষেত্রেও অবস্থাটা ভিন্ন নয় — so, let us carry on।

দিলীপ হোতা

[মূল লেখাটি একটু বেশী বড় ছিল বলে সম্পাদমণ্ডলীর পক্ষে সেটিকে সংক্ষেপ করেছে রবীন চক্রবর্তী। কিন্তু ভৌগোলিক দূরত্বের জন্য সংক্ষেপিত লেখাটি আর লেখককে দেখিয়ে নেওয়া যায়নি। এর দরুণ যদি কিছু অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তি ঘটে থাকে তবে তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। সঃ মঃ]

বিষয় ঃ নিউক্লিয়ার বিতর্ক

বি-ও-বি'র বয়স দশ হ'ল। এই দশ বছরে বহু বিষয়ে লেখা হয়েছে।—হয়েছে একই বিষয়ে হরেক লেখা। একত্রে জড়ো করলে বৈচিত্র্যে কম নয়। বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠান চিত্র, বিজ্ঞানশিক্ষা, গণবিজ্ঞান, নিউক্লিয়ার বিতর্ক, পরিবেশ সমস্যা, বিজ্ঞানকর্মী আন্দোলন, বিজ্ঞানীমন, যুদ্ধও-বিজ্ঞান, খরা-বন্যা, মানসিক ব্যাধি, সংস্কার, প্রযুক্তিভাবনা, শিল্প দূষণ, ওষুধ-স্বাস্থ্য, ইত্যাদি বহু বিষয় ছড়িয়ে আছে বি-ও-বি'র বিভিন্ন সংখ্যায়। বিষয় ধরে প্রবন্ধতালিকা অনেক কাজে লাগে। আমাদের নিজেদের তো বটেই, পাঠকেদেরও লাগতে পারে। এই ভেবে 'দশ বছরের সূচী কলমের উদ্যোগ। প্রথম কিস্তির বিষয়—'নিউক্লিয়ার বিতর্ক'। সাজানো হ'ল প্রকাশকালের ক্রমে।

পরমাণু শক্তির আসল রূপ—অভিজিৎ লাহিড়ী—নভে.-ডিসে. 1978 □ (কবিতা) অমেরিকা, নিজ হস্তে হয়োনা নিধন— মূল রচনা ঃ সাদিকো কুরিহারা, অনুবাদ ঃ সুব্রত ভট্টাচার্য—সেপ্টে-অক্টো. 1979 □ The Future of Nuclear Science in India : A View from the Experts—অমিতাভ দত্ত—মার্চ-এপ্রিল 1980 □

তারাপুরের দুর্ঘটনা কিসের ইঙ্গিত বহন করছে?—পার্থ সেন—মে-জুন 1980 □ হিরোশিমা দিবস — সেপ্টে.-অক্টো. 1980 □ হিরোশিমা দিবস—জয়ন্ত বসু ● মাইক্রোনিশিয়া ঃ আমেরিকার নয়া হিরোশিমা-নাগাসাকি—পার্থপ্রতিম মজুমদার ● India's Nuclear Paradox—অভিজিৎ লাহিড়ী ● পরমাণু শক্তি

সম্পর্কে—প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় ● শান্তিপূর্ণ হিরোশিমা—পর্যবেক্ষক —বিশেষ নিউক্লিয়ার বিরোধী সংখ্যা, নভে.-ডিসে.'80 □ নিউক্লিয়ার নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে জাপান বিজ্ঞান সমিতির বিবৃতি—জানু.-ফেব্রু. 1981 □ আর একটি রিয়্যাক্টর দুর্ঘটনা—সন্ধানী—নভে.ডিসে. 1981 □ পরমাণু অস্ত্রবিরোধী বিক্ষোভ ঃ দেশে দেশে—নিজস্ব প্রতিবেদক ●

(জানবার কথা) ফিউশন রিয়্যাক্টর বানানোর অসুবিধা কোথায়? —উদয়ন বসু—জানু.-ফেব্রু. 1982 □ (জানবার কথা) নিউট্রন বোমা জিনিসটা কি? —মার্চ এপ্রিল 1982 □ পৃথিবীর নিয়তি— রবীন মজুমদার ● একজন চিকিৎসকের জীবনী থেকে—মূল ঃ হেলেন ক্যালডিকট, অনুবাদ ঃ রবীন চক্রবর্তী ● মানবদেহে তেজ-

স্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব ● তেজস্ক্রিয় আবর্জনা ঃ কারিগরি, রাজনীতি, ঝুঁকি —সত্যবান রায় ● হিরোশিমা দিবসের নেপথ্যে— অভিজিৎ লাহিড়ী ● হিরোশিমা স্মরণে প্রতিবাদের গণকণ্ঠ—বিশেষ নিউক্লিয়ার বিরোধী সংখ্যা, সেপ্টে.-অক্টো. 1982 □ নতুন ধরনের দুর্ঘটনা—অভিজিৎ লাহিড়ী—মার্চ-এপ্রিল 1983 □ তারাপুর কত

পার্সেন্ট বিপজ্জনক? পাটিগণিতের প্রশ্ন—সন্ধানী—মে-জুন 1983 □ জনকল্যাণে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন—দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ● কার্বাইডে পক্ক কলা ঃ কলাপক্কম্ — সন্ধানী ● পারমাণবিক বছর—সন্ধানী—জুলাই-আগস্ট 1983 □ দু'হাজার সালে দশ হাজার মেগাওয়াট—সন্ধানী ● পরমাণু বিদ্যুতে

অরুচি—সন্ধানী □ সেদিনের পর — সন্ধানী — জানু.-ফেব্রু. 1984 □ নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা—সন্ধানী— মার্চ-এপ্রিল 1984 □ পরমাণু শক্তি চিত্র ঃ নানা মুখে—সন্ধানী ● নিউক্লিয় শক্তির অপব্যবহার বিরোধী কনভেশন—জুলাই-অক্টোবর 1984 □ "Stop N-Power" ঃ ডেনমার্কের সিদ্ধান্ত—সম্পাদক-

মণ্ডলী ● পারমাণবিক চুক্তির সংকট—সুখেন্দু সরকার—মার্চ এপ্রিল 1985 □ পারমাণবিক অথবা মানবিক ভারত—সৌমেন গুহ ● উপমহাদেশে নিউক্লিয়ার অস্ত্ররোধের প্রস্তাব ● পরমাণু বোমার মানসিকতা ভারতে— রবীন মজুমদার ● ডেনমার্কের নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলন ও সফলতা—সম্পাদকমণ্ডলী ●

নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলনের শহীদ : রেইনবো ওয়ারিয় ● নিউক্লিয় যুদ্ধের ভয়াবহতার ছবি "দি ডে আফটার" — র. চ. — বিশেষ নিউ-ক্লিয়ার সংখ্যা, সেপ্টে.-অক্টো. 1985 □ ভিডিও চিত্র পরিচিতি "দি ওয়ার গেম"— র. চ. ● 120,000 থেকে 10, 000 গেলে রইল বাকি কত?—ডঃ বিচক্ষণ ● GROUND এর নিউক্লিয়ার অস্ত্র

● ● বি-ও-বি'র দশ বছর ●

বিরোধিতা—সৌমেন গুহ—নভে.-ডিসে. '85 □ পরিবেশের খবর ঃ নিউক্লিয়ার আবর্জনা ডামপিং — জানু.-ফেব্রু. 1986 □ ভারতে পারমাণবিক শক্তি—মূল ঃ ডি. ডি. কোসাম্বী, অনুবাদ ঃ সুপর্ণ চৌধুরী ● তিরিশটি নিউক্লিয়ার প্রশ্ন—রবীন চক্রবর্তী ● নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনায় গোপনতা—অভিজিৎ লাহিড়ী ● ভাবা কোসাম্বী সংবাদ—অরবিন্দ গুপ্ত ● জনতার দাবিতে ফিলিপাইনসের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যাট বন্ধ হতে চলেছে—মার্চ-জুন 1986 □ চের্নোবিল—সুপর্ণ চৌধুরী—জুলাই আগস্ট 1986 □ প্রসঙ্গঃ প্রথম অ্যাটম বোমা প্রকল্পঃ অধ্যাপক ডেভিড বমের সঙ্গে সাক্ষাৎকার—দীপঙ্কর হোম, (অনুবাদ) সুপর্ণ চৌধুরী ● ক্যালডিকট দম্পতির সঙ্গে বিজ্ঞানকর্মীদের সাক্ষাৎকার—প্রতিবেদক—নভে.-ডিসে. 1986 □ সোভিয়েত ব্যবস্থায় নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি—সুরঞ্জন কর—জানু-ফেব্রু '87 □ পরমাণু তুমি কার, বিজ্ঞানের না ব্যবসার? মণীন্দ্রনারায়ন মজুমদার ● পারমাণবিক শক্তি ঃ আইনের রাজনীতি, অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়, মার্চ-এপ্রিল 1987 □

ইউরেকা-'87

ইউরেকা হল একটি প্রশ্নোত্তরের খেলা—যা কিন্তু ঠিক 'কুইজ' নয়। এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও ছোটখাট পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভ্যাস থাকা দরকার। এই প্রশ্নগুলির মূল বক্তব্য বিষয় হল হাতেকলমে মিলেমিশে শেখা। এতে পুরস্কার থাকবে—তবে তা শুধু আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ 15ই অক্টোবর 1987। 31 শে ডিসেম্বর, 1987-এর মধ্যেই বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে। প্রশ্নপত্র নীচের ঠিকানা থেকে সংগ্রহ করতে হবে। অনুরোধপত্রের সাথে এক টাকা পাঠাতে হবে। প্রতি উত্তর পত্রের সাথে এক টাকা করে অনুদান লাগবে—সেটা ছাপা ও ডাক খরচ আংশিক উসুল করার জন্যই।

সায়েন্স এডুকেশন গ্রুপ (ইউরেকা)

এন. শ্রীকুমার, রুম নাম্বার সি-224, আই. আই. টি খড়গপুর, মেদিনীপুর-721 302

কবির চিঠি প্রকাশনীর উদ্যোগে

রাঢ়ের ছোট গল্প

রাঢ় বাংলার কলমে রাঢ় বাংলার পটভূমিতে লেখা ২৫ টি ছোট গল্প সংকলন

মূল্য কুড়ি টাকা

॥ মোফিদ আলম ॥ কবির চিঠি প্রকাশনী ॥ নেহেরু পার্ক ॥ ॥ বাঁকুড়া ॥

Space Donated by :

ALIPURDUAR ENGINEERS'
Co-Operative Society Ltd.

with best compliments from

ALIPURDUAR CO-OPERATIVE
Labour Contract &
Constn. Society Ltd.

দমদম জপুরে রাসায়নিক দূষণ

দমদম ষ্টেশনের কাছেই রাস্যায়নিক কারখানা মেকল কেমিকাল। দূষণের অভিযোগ শোনা যাচ্ছিল কিছুদিন থেকে। পুর কর্তৃপক্ষ কারখানাটি সাময়িক ভাবে বন্ধ করার পর এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন এল বি-ও-বি'র হাতে—সাংবাদিক শ্রী বরেন ভট্টাচার্যের লেখা। লেখাটি দেখার পর অনেক প্রশ্ন রয়ে গেল আমাদের মনে। যে সবের উত্তর খুঁজতে বি-ওবি'র একটি টীম পর পর দিন কয়েক ঘুরে এল কারখানা এলাকায়। কথাবার্তা বলল সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে। সে সব নিয়ে নিচের দ্বিতীয় প্রতিবেদনটি তৈরী করল তাপস ঘোষ।

পুর কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ কি অভিসন্ধিমূলক

গত 10 জুন দক্ষিণ দমদমের একটি রাসায়নিক কারখানা পুর কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দিয়েছিল। কারখানাটিতে কাঁচা চামড়া ধোয়া এবং ট্যানিং-এর রাসায়নিক পদার্থ তৈরী হ'ত। বন্ধ করার কারণ হিসাবে পুরসভা থেকে বলা হয়, ওই কারখানার বর্জ্য পদার্থ যথাযথভাবে না ফেলায় এলাকার তিনটি কুয়ো এবং প্রায় সিকি মাইল দূরের একটি পুকুরের জল দূষিত হয়, অভিযোগ ওঠে পুকুরের সমস্ত মাছ মরে যায়, কুয়োর জল অব্যবহার্য হয়ে পড়ে, কারখানায় কর্মরত কর্মীদের হাতে গলায় ঘা দেখা দেয়। স্থানীয় নাগরিকদের অভিযোগ এবং বিক্ষোভের পরিণতিতে পুর-কর্তৃপক্ষ পুলিশের সহযোগিতায় গত 10 জুন কারখানাটিতে তালা লাগিয়ে দেয়। স্থানীয় নাগরিক এবং শ্রমিক কর্মচারীদের অভিযোগ, এ জন্য পুর কর্তৃপক্ষ কোন আগাম নোটিশ জারি করেনি, এমনকি জল দূষণের প্রামাণ্য তথ্যও দাখিল করেনি।

কারখানাটিতে শ্রমিক এবং কর্মচারী মিলিয়ে প্রায় একশ' জন কাজ করেন এবং একমাত্র ইউনিয়নটি 'সি আই টি ইউ'-র নিয়ন্ত্রণাধীন। ফলত, বামফ্রন্টের দখলাধীন দক্ষিণ দমদমের পুরসভা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সিটু নেতৃত্ব এবং জ-পুর এলাকায় সি পি আই (এম) কর্মী তথা নেতৃত্বের একটা ঠান্ডা লড়াইয়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সিটু কর্তৃপক্ষ, কারখানার-শ্রমিক কর্মচারী এবং জ-পুরের সাধারণ মানুষরা পুরকর্তৃপক্ষের আচরণে রীতিমত ক্ষুব্ধ। তাদের বক্তব্য, দূষণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগেই কেন কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। তা-ছাড়া আদৌ কারখানা বন্ধ করার অধিকার পুরসভার আছে কিনা সেটাও ভেবে দেখা হয়নি। যারা দূষণের অভিযোগ করছেন তারাই বা কারা? বারবার কারখানার ভিতরকার পুকুর এবং নিকাশীনালার জলের নমুনা পুর কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার জন্য নেওয়া সত্ত্বেও আজও তার রিপোর্ট প্রকাশ করা হ'ল না কেন?

এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে জ-পুর দাগা কলোনির অধিবাসী, কারখানার শ্রমিক, ইউনিয়ন নেতা এবং পৌর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিম্নলিখিত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

জ-পুর রোডে দীর্ঘ লম্বা প্রাচীর বেষ্টিত ষ্টীম লন্ড্রীর কম্পাউন্ডের মধ্যে চামড়া ধোলাইয়ের রসায়নিক উৎপাদনের এই সংস্থা মেকল কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী। মাত্র বছর তিনেক আগে এই সংস্থাটি এখানে সোডিয়াম-বাই-ক্রোমেট উৎপাদন শুরু করে। কর্মীরা প্রায় সবাই স্থানীয়।

সংস্থার সিটু ইউনিয়ন সম্পাদক দীপক মুখার্জী জানান, এক বছর বাদেই সংস্থাটির মালিকানা বদল হয়। সে সময় বর্জ্য-পদার্থ কারখানার কম্পাউন্ডের মধ্যেই মাটিতে গভীর গর্ত খুঁড়ে মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হ'ত। এতে দূষণের সম্ভাবনা থাকায় ইউনিয়নের দাবীতে বর্জ্য পদার্থ গুলিকে একটি স্টেনলেস স্টীলের পাত্রে জমা করে পরে তা ধাপায় গিয়ে ফেলে আসা হতে থাকে। ফলে দূষণের সম্ভাবনা বিলীন হয়। কিন্তু খালি হাতে যাদের রাসায়নিক পদার্থ ঘাঁটাঘাঁটি করতে হ'য় তাদের হাতে চর্মরোগের সম্ভাবনা থেকেই যায়। এ ধরনের চর্মরোগের কোন ঘটনা এখানে কারো হয়েছে কি?

উত্তরে শ্রী মুখার্জী জানান, একটি ক্ষেত্রে একজন শ্রমিকের এরকম চর্মরোগ দেখা গিয়েছিল, তবে তার হাতে আগেই এক্সিমা ছিল।

তিনি আরও বলেন, সেটা যাই হোক, এগুলি কোন ভাবেই পুরসভার এক্তিয়ারভুক্ত নয়। এগুলো দেখার জন্য আছেন দূষণ নিরোধ দপ্তর, আছেন ফ্যাক্টরী পরিদর্শন বিভাগ। কিন্তু কিছু উদ্দেশ্যপরায়ন লোকের মুখ থেকে একতরফা কিছু অভিযোগ শুনে পুলিশ দিয়ে গায়ের জোরে কারখানা বন্ধ করার অধিকার পুরকর্তৃপক্ষের থাকতে পারে না।

স্থানীয় পুকুর এবং কুয়োর জল দূষণের অভিযোগ সম্পর্কে শ্রী মুখার্জী বলেন, যে পুকুরটির কথা বলা হচ্ছে সেটির অবস্থান এখান থেকে বেশ দূরে এবং উঁচুতে। দেখুননা, কারখানা চত্বরের ভিতরেই তো পুকুর রয়েছে। এখানে এই চত্বরের আটটা কারখানার শ্রমিক কর্মচারীরা হাত মুখ ধোয়, স্নান করে। এর জল বহুবার মিউনিসিপ্যালিটি নমুনা হিসাবে নিয়ে গিয়েছে। এটাতেই কোন রকম দূষণ হ'লনা, আর কারখানার প্রাচীরের বাইরের পুকুর ও কুয়োর জল কি ভাবে দূষিত হয়। গত 20 শে জুন রাজ্য দূষণ দপ্তরের অফিসার, ডাক্তার এবং পুর-কর্তৃপক্ষ কুয়োর জলের নমুনা সংগ্রহ করতে এলে কুয়োর মালিকরা সে জল নিতে দেয়নি। কুয়োর মালিকরা জানায়, তারা ব্লিচিং পাউডার দিয়ে নাকি জল শোধন করে নিয়েছেন।

—তাহলে দূষণের অভিযোগ কারা তুলেছিলেন ? এই প্রশ্নের জবাবে জনৈক কারখানাকর্মী জানান, মূলত 12 নম্বর ওয়ার্ডের দাগা কলোনির কিছু ব্যক্তি এবং ঐ ওয়ার্ডের কমিশনার দীর্ঘ দিন ধরে এই অভিযোগ করছিলেন। অথচ মজার কথা হ'ল মেকল কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী পুরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ডের অধীন।

—এর পিছনে কোন উদ্দেশ্য আছে বলে আপনার মনে হয় ?

—একটাই উদ্দেশ্য, কারখানার মধ্যে বিশেষ একটি গোষ্ঠী তথা দলের একচেটিয়া কর্তৃত্ব আর খবরদারী করতে না পারা। এখানে কোনো এক রাজনৈতিক দলের জনৈক কর্মী চাকরি করতেন। তাকে অনিয়মিত হাজিরা, কাজকর্ম না করা এবং দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে ছাঁটাই করা হয়। পরে সে বার কয়েক দলবল নিয়ে হামলা চালায়। এ সম্পর্কে মালিকের পক্ষ থেকে পুলিশে ডায়েরীও করা হয়। এর পর থেকেই তারা কারখানা বন্ধ করার নানা ফিকির খুঁজতে থাকে।

স্থানীয় কিছু জ-পুরের বাসিন্দা কমিশনারের নামে জোর করে তোলা আদায়ের অভিযোগও করলেন।

স্থানীয় লোকেরা আরো জানালেন, দূষণের অভিযোগে সবার আগে যদি কাউকে অভিযুক্ত করতে হয় তবে তা ঐ কমিশনারকেই। তাঁর ওয়ার্ডেই দমদমের সব চেয়ে বড় খাটাল। খাটালের রাশি রাশি গোবর দমদমের বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাগজোলা খালে গিয়ে পড়ে গোটা খালটা মজিয়ে দিয়েছে। গোটা খাল জুড়ে এখন শুধু দুর্গন্ধ, কালো পাঁক আর কচুরিপানা। নাগেরবাজারে দক্ষিণ দমদমের পুরসভা দপ্তর। সেখানকার ভাইস চেয়ারম্যানের (নির্দল হিসাবে নির্বাচিত) কাছে মেকল কেমিক্যাল বন্ধের প্রসঙ্গ তুলতে তিনি বললেন, দূষণের অভিযোগ দীর্ঘ দিনই ছিল। এই নিয়ে লোকের মনে বিক্ষোভও ছিল। কিছু লোক হাতে ঘা নিয়ে দপ্তরে এসেছিল অভিযোগ জানাতে। ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনার পরে আমারা সবাই আতঙ্কিত। তাই বাধ্য হয়ে ব্যবস্থা নিতে হয়। তবে আমরা তো কারখানা বন্ধ করিনি। পুলিশের সামনেই কারখানার মালিক নিজের হাতে কারখানা বন্ধ করেছে।

অথচ কারখানার শ্রমিকরা কিন্তু সাক্ষ্য দিলেন, পুরসভার স্যানিটারী ইন্সপেক্টর নিজে হাতে তালা লাগিয়ে মালিককে চাপ দিয়ে লিখিয়ে নেয়।

কোন আগাম নোটিশ সার্ভ করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে ভাইস চেয়ারমান জানান, না তেমন কিছু হয়নি। তবে এবছর মার্চে ওদের লাইসেন্স নবীকরণ করা হয়নি। বিনা লাইসেন্সে উৎপাদন চালানো তো বেআইনী।

এদিকে কারখানা বন্ধের পর জ-পুরের সি পি আই (এম)-এর শাখা কমিটি এবং সিটু কর্তৃপক্ষ দলের নেতৃত্বের কাছে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছেন। গত 16 জুন কারখানার শ্রমিক কর্মচারী, ইউনিয়ন মালিক এবং পুরসভা কর্তৃপক্ষের মিলিত বৈঠকেও কোন জট খোলা যায়নি। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয়, আগে সংগৃহীত জলের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট আসুক তারপর দেখা যাবে। পরবর্তী পর্যায়ে স্থানীয় এম. এল. এ এবং মন্ত্রীর উপস্থিতিতেও আলোচনা হয়েছে, সমাধানের চেষ্টায়।

অপরদিকে দক্ষিণ দমদম পুর সভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং একজন প্রথম শ্রেণীর রসায়নবিদ শ্রী সুনীল মৈত্র জানিয়েছে, কারখানাটিতে যে ধরনের কেমিকেল তৈরি হয় তাতে পরিবেশ বা জল দূষণের সম্ভাবনা কম। সামাগ্রিক বিচারে এটা বলা বোধহয় অযৌক্তিক হবে না, রাজনৈতিক শরিকী দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছেন শ'খানেক শ্রমিক কর্মচারী পরিবার। □

জপুর : বিপন্ন পরিবেশ ও মানুষ

দমদম স্টেশন থেকে খুব কাছে আবার নাগেরবাজার থেকেও বেশী দূরে নয়—এমন এক জায়গায় জপুর রোড। কলোনি-অধ্যুষিত অঞ্চলটি বৃহত্তর কলকাতা বা আরও ছোটো করে ভাবলে দমদম রোডের চেয়ে পরিবেশের কিছু বাড়তি সুবিধে নিয়েই বেঁচে আছে। চারদিকে গাছ গাছালি, পুকুর-ভরা মাছ, ছোটো বড়ো আরও নানা রকম উদ্ভিদ-প্রাণী আর মানুষের এই সমৃদ্ধ ইকোসিস্টেম মেকল কেমিকালের দূষণের (pollution) কারণে আজ বিপন্ন। অথচ একটি ব্যবসায়ী-চক্র এই কারখানা বাঁচিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। আর এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিছু রাজনীতিক। লাভের গুড় (জনসাধারণের ভাগ্যে) একশো শ্রমিকের চাকরি। উল্টো দিকে রয়েছে প্রায় দেড়শো-দুশো মানুষের বাঁচা অথবা মরা, সুস্থ থাকা বা না-থাকা, বাড়ীর কুয়ো ব্যবহার করতে পারা বা না-পারা, শ্যালোয় সন্দেহ আর রাত বিরেতে শ্বাসকষ্টের আশংকা। একদিক মা-ভাইয়ের চর্মরোগ আর অন্যদিকে নেতার 'কিছু করা যাবে না' টাইপ প্রতিশ্রুতি। আর, আজ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা দেড়শো-দুশো হলেও, কাল সে সংখ্যার পেছনে একটি বা দুটি শূন্য বসলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। অর্থাৎ দূষণ প্রভাবিত এলাকার আয়তন বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল।

প্রাথমিকভাবে সোডিয়াম বাইক্রোমেট তৈরির জন্যে প্রয়োজন, ক্রোমাইট আকরিক, ক্রোমিআম আয়রণ অক্সাইড—যাতে শতকরা 50 ভাগ থাকে ক্রোমিক অক্সাইড আর বাদবাকী ফেরাস অক্সাইড, অ্যালু-

মিনা, সিলিকা আর ম্যাগ্‌নেসিআম অক্সাইড। ক্রোমাইট আকরিক, সোডা অ্যাশ ও চুনাপাথর খুব ভালোভাবে মেশানো হয়। মিশ্রণটিকে এবার অবাধে হাওয়া চলাচল করতে পারে এমন একটি চুল্লীতে জারক আবহাওয়ায় নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়। উৎপন্ন পদার্থটি চূর্ণ করে ও উষ্ণ জলে লিচিং করে দ্রবীভূত সোডিআম ক্রোমেট পাওয়া যায়। এটি আবার সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৈরি করে সোডিআম বাইক্রোমেট। আর বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে তৈরি হয় সোডিআম সালফেট। যার খুব অল্প অংশই এভাপোরেটর এর ওপর জমা হয়—বাইক্রোমেট দ্রবণটিকে গাঢ় করার জন্যে; আর বেশির ভাগ অংশ অ্যাসিডিফিকেশনের সময়ে ফুটন্ত উত্তপ্ত দ্রবণ থেকে অ্যান্‌হাইড্রাস ক্রিস্ট্যাল (মানে যাতে জলের অণু থাকবে না) হিসেবে বেরিয়ে আসে।

> 9. 6. 87 তারিখে দাগা কলোনীর কিছু বাড়ীর কুয়োর জলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করার পর যে রিপোর্ট Pollution Control Board, Barrackpur থেকে পাওয়া গেছে তা কিন্তু ভীষণ ভাবে আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে। গণেশ চক্রবর্তী, অলক সরকার ও ডঃ দীপালি মজুমদারের বাড়ীর কুয়োর জলের pH মাত্রা হল যথাক্রমে 7.25, 7.3 ও 7.33 আর Hexavalent Chromium হল যথাক্রমে 52.5, 20.0 mg/l ও 25 0.। □

বাতাসের প্রচুর অক্সিজেন ব্যবহার করে প্রথম বিক্রিয়াটিতে তৈরি হয় কার্বন ডাই-অক্সাইড। এটি তেমন বেশি পলিউট্যান্ট বা দূষক না হলেও কারখানা অঞ্চলের বাতাসে কিছু পরিবর্তন সাধন করতে পারে এটি। আমরা জানি বায়ুমন্ডলে কার্বন চক্র (Carbon Cycle) ও অক্সিজেন চক্র (Oxygen Cycle) নামে দুটি ঘটনা ঘটছে সব সময়ই। বলা বাহুল্য, বিক্রিয়াটি এই চক্র দুটির স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করে—বাতাস থেকে প্রচুর অক্সিজেন গ্রহণ আর কার্বন ডাই অক্সাইড বাতাসে বর্জনের মাধ্যমে যা কোনো প্রাণী-উদ্ভিদ ব্যবহারই কাম্য হতে পারে না।

এর পর আসে পদ্ধতিটির দ্বিতীয় ধাপে সালফিউরিক অ্যাসিডের ব্যবহার যা থেকে কিছুটা সালফার ট্রাই-অক্সাইড তৈরি হয়ই যা আবার বাতাসের জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে জল-মাটিতে সালফিউরিক অ্যাসিড ছড়াতে পারে। স্বাভাবিক কারণেই জল-মাটির অম্লতা নির্দেশক (pH) বদলে দেবে এটি—যাতে সমূহ বিপদ ছোটো ছোটো প্রাণী ও উদ্ভিদের।

আগেই আমরা দেখেছি দ্বিতীয় বিক্রিয়াটির বাই-প্রোডাক্ট সোডিআম সালফেট—যার খুব অল্প অংশই কারখানার কাজে লাগে। তা হলে এই বস্তুটি নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ কী করতো? ডাম্পিং করতো ফ্যাক্টরি চত্বরেই পাঁচিলের ধারে একটা জায়গায়। এই সোডিআম সালফেট-এর সঙ্গে ক্রোমিআম (Cr +6—অর্থাৎ ছয় যোজ্যতার ক্রোমিআম) কিছু আসেই, যা সারফেস পারকোলেশনের মাধ্যমে অর্থাৎ চুঁইয়ে এসে মেশে জল ও মাটিতে।

জলে প্রত্যেকটি দূষকের একটি সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য মাত্রা (Maximum Permissible Concentration বা MPC) আছে যা প্রতি দশ লক্ষ ভাগ ওজনে কতো ভাগ আছে (ppmw বা parts per million parts of water, a weight ratio) তা দিয়ে মাপা যেতে পারে। দেখা গেছে, পানীয় জলে Cr+6-এর এই মাত্রা বিশ্বব্যাপী নির্দিষ্ট হয়েছে 0 05 mg/l; এবং কানাডায় নাকি তার থেকেও কম। এছাড়া surface water-এর ক্ষেত্রে Occupational Safety and Health Administration-এর নির্ধারিত মাত্রা 1. mg/l

> শ্যামল দে ও পার্থ দত্তের সংগৃহীত জলের নমুনা বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের মেরিন সাইন্সের বিভাগীয় প্রধান শ্রীঅমলেশ চৌধুরী 23.6.87-তে পরীক্ষা করে জানিয়েছেন যে সংগৃহীত জলে ক্রোমিয়ামের মাত্রা যথাক্রমে প্রতি লিটারে 55.7mg, 5.37mg, 19.8 mg, 19.05 mg, 3.92 mg. 17.1 mg. ও 1.96 mg, এর প্রতিটিই হল কুয়ার জল। পুকুরের জলে এই মাত্রা 1 95 mg/ 1. □

দাগা কলোনিতে প্রায় সর্বত্র ঐ মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। হয়েছে অনেক গুণ বেশী। জলের রঙ হয়েছে হলুদ। চামড়ায় পড়লে জ্বালা করছে, ঘামাচির ওপর ফেললে ঘা হয়ে যাচ্ছে।

এ'ছাড়া ক্রোমেট বা বাইক্রোমেট-ডাস্ট বা ক্রোমিক অ্যাসিড-মিস্ট বাতাসকে দূষিত করছে। তৈরি করছে জলকণার সঙ্গে যুক্ত বাতাসে ভাসমান বিভিন্ন রকমের কণা (গিবস যার জেনেরিক নাম দিয়েছেন Aerosol)। বাতাসে দূষকের মাত্রা মাপা যায় প্রতি দশ লক্ষ ভাগ আয়তনে কতো ভাগ আছে (ppm বা parts per million parts of air, a volume ratio)—তা দিয়ে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরিমাপক হলো TLV বা Threshold Limiting Value—এটি বার করেছে আমেরিকান কনফারেন্স অফ গভরনমেন্টাল ইনডাস্ট্রিআল হাইজিনিস্টস বা ACGIH-এর TLV কমিটি। ক্রোমিআমের TLV হলো—দ্রাব্য যৌগগুলির ক্ষেত্রে, 0.5 mg/m^3 আর অদ্রাব্য ও ধাতব যৌগগুলির ক্ষেত্রে 0.1 mg/m^3। বলে রাখা ভালো যে এই মাত্রা কারখানার শ্রমিকদের জন্যে তৈরি; আর বাইরের সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য মাত্রাটি স্বাভাবিক কারণেই এর থেকে কম রাখা হয়। মেকল কেমিকাল এই মাত্রার তো ধারই ধারে না, পরন্তু ক্রোমিআম যৌগ প্রস্তুতির তিন দশকের পুরোনো ন্যূনতম নিরাপত্তা-স্ট্যান্ডার্ড গুলোও মানে না (যদিও পূর্ণ নিরাপত্তা কখনই হতে পারে না)।

আসল কথা, আর্থনীতিক সুবিধের দিকে নজর রাখতে গিয়ে রাসায়নিক শিল্প কারখানাগুলো যেরকম ঢিলেঢালা ভাবে তৈরি করা হয় এ কারখানাও তার ব্যতিক্রম নয়।

এ'দিকে পলিউট্যান্ট Cr^{+6} বা ক্রোমিআম যৌগগুলো স্বাস্থ্যের শুধু আশু ক্ষতিসাধনই করে না, এর ফলসুদুর প্রসারীও হতে পারে। এগুলির Toxicology হলো, চামড়ার ওপর যন্ত্রনাদায়ক (irritative) ও ক্ষয়কারক (corrosive) প্রতিক্রিয়া তৈরি। এটি হয় শরীরের যে অংশ সরাসরি বাতাসের ও জলের সংস্পর্শে আসছে—প্রধানত সেই অংশেই—অর্থাৎ হাতের চেটো ও বাহুর সামনের অংশে, পায়ের উন্মুক্ত অংশে, নাকের মিউকাস মেমব্রেনে। তাছাড়া গ্রীষ্মপ্রধান দেশ আমাদের। তাই

> West Bengal Pollution Control Board 26.6.87-এ দক্ষিণ দমদম নিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে যে চিঠি পাঠিয়েছে তাতে পরিষ্কার ভাবে কারখানা কর্তৃপক্ষর কার্যকলাপের বিরোধিতা করে বলা হয়েছে যে West Bengal Pollution Control Board-এর অনুমতি ব্যতীত কোনো কারখানা ফ্যাক্টরির বাইরে জল ছাড়তে পারে না [Section 25 & 26 of the Water Act 1974] এবং গ্যাস ছাড়তে পারে না [section 21 of the Air Act 1981)। চিঠিটির শেষ ছত্রটিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে "Thus the said industry could not be allowed to continue in a densely populated area like Dum Dum"

শরীর আমরা একটু বেশীই খোলা রাখি। সেজন্য শরীরের অন্য জায়গাতেও প্রতিক্রিয়া হতে পারে। ওআইসবাজইার-এর "Industrial Cancer Risks" প্রবন্ধটি থেকে জানা যায়—মানুষের চিহ্নিত কার্সিনোজেন-গুলোর একটি হলো ক্রোমেট। অর্থাৎ, এটি ফুসফুস, নেসাল ক্যাভিটি বা প্যারানেসাল সাইনাস-এ ক্যানসার এর কারণ হতে পারে। এছাড়া এটি স্টম্যাক বা ল্যারিংক্স-এ ক্যানসার ঘটায় কিনা তার ওপর পরীক্ষাও চলছে। এস. পি. মহাজন-এর মতে, কিডনিকেও নষ্ট করতে পারে ক্রোমিয়াম।

ক্রোমিআম যৌগগুলোর THR (Toxic Hazard Rating) খুব ভালো জানা যায়—এক ডজন-এরও বেশী জনের সাহায্য নিয়ে লেখা, এন. আরভিঙ স্যাক্স এর অসাধারণ বইটি থেকে। জানা যায়, খুব বেশী দিন ধরে নিয়মিত ক্রোমিআম যৌগের এক্সপোজার (irritation, inge-stion বা inhalation যে ভাবেই হোক না কেন) মৃত্যু বা স্থায়ী ক্ষত বা অঙ্গবিকৃতি ঘটাতে পারে (ক্রনিক সিস্টেমিক); এমনকি একবার মাত্র এক্সপোজার থেকেও ক্ষতি হতে পারে (অ্যাকিউট লোকাল); অনেক দিন ধরে মাঝে মাঝে বা বার বার এক্সপোজার হলেও ক্ষতি হতে পারে (ক্রনিক লোকাল)—তিন ক্ষেত্রেই Toxicity = অত্যন্ত বেশী।

এতো গেলো শুধু মানুষের ক্ষয়ক্ষতির হিসেব। এছাড়া আছে গাছের ক্ষয়ক্ষতি, যা হতে পারে মাটি ও বায়ুর দূষণ থেকে। যেমন মাটিতে জলের স্বাভাবিক প্রবাহে, বা জল দেওয়া হলে সে জলে, ক্রোমিআমের মাত্রা 5.0 mg/l-এর বেশী হওয়া চলবে না এই হচ্ছে নিয়ম। স্বাভাবিক কারণেই ঐ অঞ্চলে গাছ পালার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে—ক্রোমি আমের মাত্রা বিপদসীমার বা সহ্যক্ষমতার (tolerance) বাইরে চলে যাওয়ায়।

ক্রোমিআম জলের অম্লতা নির্দেশকেরও (pH) পরিবর্তন ঘটায়, ফলে ছোটো ছোটো জলজ উদ্ভিদ প্রাণীর অকালমৃত্যু খাদ্যচক্র তথা পরি বেশের সামগ্রিক ভারসাম্যকেও নষ্ট করবে।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা এসে পড়ে। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন (Dissolved Oxygen বা DO), একদিকে যেমন জলজ জীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্যদিকে তেমনি দূষকের অক্সিডেশনের জন্যেও প্রয়োজন। তাই এই DO এবং বায়োকেমিক্যাল বা বায়োলজিকাল অক্সিজেন ডিমান্ড (Biochemical or Biological Oxygen De mand বা BOD—অর্থাৎ একটি বর্জ্য পদার্থের ওপর ব্যাকটিরিআল অ্যাক্শনের জন্যে যতটা অক্সিজেন প্রয়োজন) ও কেমিকাল অক্সিজেন ডিমান্ড (Chemical Oxygen Demand বা COD অর্থাৎ বর্জ্য পদার্থ কেমিকাল অক্সিডেশনের জন্যে যতটা অক্সিজেন কাজে লাগায়) জলের দূষণের বিশেষ পরিমাপক (Critical Parameter)। এ ক্ষেত্রেও কারখানাটির এফ্লুএন্টগুলো প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করতে পারে।

সোডিআম বাইক্রোমেট কাজে লাগে ক্রোম-ট্যানিং এর জন্যে (উল্লেখ্য, জপুরের কারখানার সমস্ত প্রোডাক্টই যায় ট্যাংরার ট্যানারিতে)। চামড়ার (skin) ওপরের এপিডার্মিস ও নীচের ফ্লেশ-কে সরিয়ে মাঝের ডার্মা বা কোরিআম অংশটিকে ট্যানিং করা হয় ঐ দিয়ে। এমনকি ট্যানারিতেও (যদিও জুতো নরম করতে ক্রোম ট্যানিং এর জুড়ি নেই) ক্রোমিআম একটি দূষক হিসাবে চিহ্নিত।

নিছকই শিল্পপতির সংকীর্ণ স্বার্থে ঐরকম একটি ক্ষতিকারক ও বিপজ্জনক শিল্পকে দমদম জপুরের জনবহুল অঞ্চলের বুকে চলতে দেওয়া যায় না। কারখানার শ্রমিক (কারখানার বাতাসে ক্রোমিআম ট্রাই-অক্সাইডের ACGIH নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য মাত্রা যদিও 0.1 mg/m^3—কর্তৃপক্ষ সে মাত্রা নিয়ে আদৌ ভাবিত এমন প্রমাণ মেলে না) সহ এলাকার সমস্ত মানুষ তথা এই অঞ্চলের সামগ্রিক প্রাণী-উদ্ভিদ জগতের ক্রমশ বিপর্যয় ডেকে আনছে এই অশুভ শিল্প। যারা এটা বুঝছে তারা ঐ কারখানা বন্ধ করার জন্যে সচেষ্ট। আন্দোলনের মাধ্যমে এবং আদালতে গিয়েও। আমাদের সমর্থন থাকুক তাদের জন্যে।□

গ্রন্থপরিচিতি ঃ 'হিরোশিমা ও নাগাসাকি'

HIROSHIMA AND NAGASAKI : The Physical, Medical, and Social Effects of the Atomic Bombings ; সম্পাদনা : The Commtitee for the Compilation of Materials on Damage Caused by the Atomic Bombs in Hiroshima and Nagasaki ; জাপানী থেকে অনুবাদ : Eisei Ishikawa এবং David L. Swain ; প্রকাশনা : Basic Books, Inc., (New York, 1981). দাম লেখা নেই (সম্ভবত দু'শো থেকে আড়াইশো টাকার মতো)।

একজন মানুষের জীবনে, শত শত বই অনেক সময়, শক্তি ও অর্থ কেড়ে নেওয়ার পর, বোধহয় মাত্র দু'একটা বইয়ের কথাই সারা জীবন ধরে মনে আসে—যে বই কয়েকটার কাছে সমস্ত জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ইস্পাত কঠিন হয়ে ওঠার জন্যে আশ্রয় পায়, প্রশ্রয় পায়। উল্লিখিত বিশাল বইটি আমার কাছে তাই মনে হয়েছে।

সমালোচনা নয়, পরিচিতি লিখতে বসে, প্রথম মনে হয়েছে—নিউক্লিয়ার অস্ত্রের বিভীষিকাকে অন্তর দিয়ে যারা ধিক্কার জানাতে চায়—এ বইটা তারা যে কোনোভাবে সংগ্রহ করুক—না হলে সত্যিই অপূরণীয় ফাঁক থেকে যাবে।

মোট 706 পৃষ্ঠার বইটির টাইটেল পেজে পেঁছিতে হয় পঁচিশটি ফটো অতিক্রম করে। বোমা বিস্ফোরণ দিয়ে শুরু—বীভৎসতা, ধ্বংস দিয়ে তৈরী পঁচিশটা আয়নার সামনে দিয়ে গিয়ে বইটায় পেঁছিবেন একটা জ্বালা নিয়ে—হিরোশিমা ও নাগাসাকি !

মূল বইয়ের চারটি ভাগে চৌদ্দটি অধ্যায়। প্রথম ভাগ—ধ্বংসের বস্তুগত দিক (Physical Aspects of Destruction)। দ্বিতীয় ভাগ—মানব দেহে ক্ষয়ক্ষতি (Injury to The Human Body)। তৃতীয় ভাগ—সমাজ ও দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব (The Impact on Society and Daily Life)। চতুর্থ ভাগ—নিউক্লিয়ার অস্ত্র বন্ধ করার পথে (Toward the Abolition of Nuclear Arms)। চারটি ভাগের আলোচনায় আছে দেড়শোর মতো চিত্র। প্রতিটি অধ্যায়ে অজস্র বিভাগ। বইয়ের পরিশিষ্টের প্রথমে হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরের মেয়রদের পৃথক দু'টি শান্তি ঘোষণা। তারপর—1945-78 সালের ঘটনাপঞ্জী, সাল ও তারিখ দিয়ে একটানা।

এর পর সম্পাদকমন্ডলীর পরিচিতি। দীর্ঘ 39 পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থপঞ্জী। সব শেষে ইন্ডেক্স।

হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরের মেয়ররা 1976 সালে রাষ্ট্রসংঘে যখন, নিউক্লিয়ার অস্ত্র সম্পূর্ণ বন্ধ করার দাবীপত্র পেশ করে—এ দাবীপত্র লিখেছিলো একটি কমিটি, যারা বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো সাজিয়ে দাবীটিকে জোরদার করে। এর পরই একটা পরিকল্পনা করা হয়—সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য সংকলন করে একটি এক খন্ডের বই করতে হবে। কাজ শুরু হলো 1977 সালের গ্রীষ্ম থেকে। পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও মানববিদ্যার বিভিন্ন শাখার 34 জন বিশেষজ্ঞকে দায়িত্ব দেওয়া হলো—মূল অংশটা লেখার। পরে 1978 সালের শেষে সমস্ত পান্ডুলিপি নিয়ে বসা হলো এক সাথে। নানা সংশোধন ও সংযোজন করে অবশেষে সমগ্র বইটার নিটোল পান্ডুলিপি খাড়া হলো। এই কমিটির ভাষায়—'কাজেই, এ বইটি কতকগুলো প্রবন্ধের নিছক সংকলন নয় ; বরঞ্চ এটা হলো একটা যৌথভাবে রচিত একক গ্রন্থ।'

উল্লেখ্য—সমস্ত কিছুই কিন্তু এককভাবে জাপানের প্রচেষ্টায় হয়েছে। এবং মূল গ্রন্থটি প্রথমে জাপানী ভাষায় প্রকাশিত হয় 1979 সালে। তারপর সামান্য পরিমার্জনা করে ইংরেজী সংস্করণ। কমিটির উদ্দেশ্য পরিষ্কার—সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে মানুষকে জাগানো, নিউক্লিয়ার অস্ত্রের বিভীষিকাকে তুলে ধরে। কাজেই সেই অর্থে—কমিটি অবশ্যই খোলাখুলি কোনো 'না-মানে-হ্যাঁ-কিন্তু-হয়তো' জাতীয় 'মূল্যমুক্ত' বিজ্ঞান করতে নামে নি।

এই সম্পাদক কমিটি প্রকাশ্যেই একটি পক্ষ বেছে নিয়েছে—নিউক্লিয়ার অস্ত্রবিরোধী পক্ষ, নিউক্লিয়ার অস্ত্রে বিধ্বস্ত-ক্ষতিগ্রস্ত-আক্রান্ত মানুষদের পক্ষ। সুস্পষ্ট ভাষায় তাই বলা হয়েছে—নিউক্লিয়ার অস্ত্র সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে, এই বোধ তৈরীর জন্যে, সারা পৃথিবীর মানুষের নিজের কাছে রাখার মতো 'একটা হাতিয়ার' হিসেবে বইটি পরিকল্পিত। আর এই সুস্পষ্ট পক্ষপাত, আমার কাছে বইটির সব থেকে দামী চরিত্র।

কারণ—ভীষণ টেকনিক্যালী লেখা বিরাট তথ্যের আকরগ্রন্থ দেখেছি, The Effects of Nuclear Weapons, আমেরিকার সরকারী প্রকাশনা। কেন যে বীভৎস ধ্বংসের চরিত্র জানছেন—বুঝতে পারবেন না। অজস্র লক্ষ তথ্যের ভীড়ে—আপনাকে একটা পক্ষ নিতে হবে নিজের শক্তিতে। আবার মমতা, ভালবাসা ভরা, জন হার্মি লিখিত Hiroshima, বিধ্বংসের একটা বছরের মধ্যে প্রকাশিত। বুকটা প্রচন্ড জ্বলে ওঠে ছোট্টো বইটা পড়লে। কিন্তু বিবেক যেখানে গ্রাফ্-টেব্‌ল্-স্ট্যাটিস্টিকস্-গবেষণার অপেক্ষায় বসে থাকে, অপেক্ষা করে থাকে হাজারটা প্রকাশিত প্রবন্ধের সমর্থনের—তখন জন্ হার্মি-র মমতামাখা 'হিরোশিমা' আশাহত হবে, কারণ আমরা 'র‍্যাশনাল'! এখানেই উল্লিখিত বইটির স্বাতন্ত্র্য।

হাজার কয়েক প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, গ্রন্থ থেকে সংকলিত তথ্য সুন্দর করে সাজিয়ে—বইটি ক্রমশ পাঠককে নিয়ে প্রবেশ করেছে নিখাদ ধ্বংসের অন্ধকারে। সম্পাদক কমিটির ভূমিকার প্রথম লাইন—'পারমাণবিক ধ্বংস কাকে বলে?' সমস্ত বইটি তার উত্তর। অবিশ্বাস্য এই অন্ধকার ধ্বংসস্তূপের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির ওপর আলো ফেলে ফেলে দেখিয়েছে বইটি—কিন্তু এতোটুকু ভাবাবেগের অবকাশ না রেখে। ইটপাথর, বাড়ীঘর, গাছপালা, জলমাটি, মানব দেহ, জন্মমৃত্যু, কর্ম পেশা এমনকি বিবাহ, দাম্পত্যজীবন পর্যন্ত খুঁটিনাটি। নিঃশব্দে শুষ্ক তথ্য, সারণী, চিত্র দিয়ে বইটি 'র‍্যাশনালিটি'তে ফাঁক রাখেনি। অথচ কোথাও কোনো একটা চাপা 'ইমোশন্' আছেই—

না হলে, নিউক্লিয়ার বোমা যারা তৈরী করেছে করছে, যারা ব্যবহার করেছে করছে—তাদের প্রতি নিদারুণ ঘৃণা সঞ্চিত হয় কেন—বইটা পড়তে পড়তে?

না কি—ঘৃণাও কখনো 'র‍্যাশনালী' জাগতে পারে, জাগানো যায়? 'hard science'এর সামাজিক উপকারিতা কী, জানি না। কিন্তু সমাজের আক্রান্ত মানুষের স্বপক্ষে hard science-এর মানবতাবাদী জ্ঞানচর্চার এক আদর্শ এই আলোচ্য বইটি। এর জন্যেও, বইটি হাজার বইয়ের ভীড়ে হারাবে না।

সৌমেন গুহ □

লক্ষ্মীকান্তপুরের পরিবেশ আন্দোলন

দক্ষিণ 24-পরগণা জেলার মন্দিরবাজার থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীকান্তপুর এলাকায় এক অভিনব আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এক কথায় একে বলা যায় পরিবেশ-দূষণ বিরোধী আন্দোলন। মাত্র আট মাস আগে শুরু হলেও বর্তমানে এই আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে। আন্দোলনের পুরোভাগে আছে "মন্দিরবাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি।" কমিটির সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন এলাকার বহু সংখ্যক মানুষ। একটি উদ্দেশ্যে দলমত নির্বিশেষে সর্ব স্তরের মানুষের এমন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অন্তত এই এলাকায় এর আগে আর হয়নি বলে জানা গেল।

এই এলাকায় বেসরকারী উদ্যোগে এক রাসায়নিক সার কারখানা স্থাপনের তোড়জোড় শুরু হয়েছিল আজ থেকে আট মাস আগে। বলতে গেলে তার সাথে সাথেই আরম্ভ হয়েছে পরিবেশ-দূষণ বিরোধী আন্দোলন। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, যেহেতু (1) প্রস্তাবিত কারখানা এলাকার ধারে কাছে চওড়া খাল বা নদী নেই, (2) এলাকাটা ঘন জন বসতির মধ্যে অবস্থিত এবং (3) সমগ্র এলাকাটি সেচবিহীন ও এক-ফসলী তাই উক্ত সার কারখানা স্থাপিত হলে নানাভাবে পরিবেশ দূষিত হয়ে সমগ্র এলাকার সমূহ সর্বনাশ ডেকে আনবে।

অন্যদিকে কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রচার করছেন যে, প্রস্তাবিত কারখানায় দূষণ নিরোধক সবরকম অত্যাধুনিক ব্যবস্থা থাকবে। সুতরাং পরিবেশ দূষণের আশংকা নেই বললেই চলে। বরং সার কারখানা স্থাপিত হলে বেশ কিছু বেকারের চাকরীর সুযোগ হবে এবং সমগ্র এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটবে। কিন্তু তাঁদের এই আশ্বাসবাণীতে এলকার বেশীর ভাগ মানুষ আস্থা রাখতে পারছেন না।

এই আস্থা না রাখতে পারার অনেক কারণ রয়েছে। যেমন, প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল করতে এবং দূষণ-বিরোধী ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে "মন্দির বাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি" ইতিমধ্যে এলাকায় বহু সভা-সমিতি, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করেছেন। সিনেমা, স্লাইড ও ভি ডি ও-র মাধ্যমে দেখানো হয়েছে নানারকম দূষণের মারাত্মক কুফল। সেইসঙ্গে ছড়া, গান, কবিতা, পাঁচালী, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ, বিশেষ ক'রে সার কারখানাজাত দূষণ সম্পর্কে এলাকার ব্যাপক জনমনে আলোড়ন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

এই সব অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন কল্যাণী, কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন অধ্যাপক, খড়দহের সি. আই. এফ.আর.আই-এর বিজ্ঞানী, এবং বিজ্ঞান-কর্মী সংস্থাও তথা 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার বন্ধুরা।

প্রতিরোধ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত জানালেন, কোলকাতার "বিজ্ঞান মঞ্চ", আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের বিজ্ঞান বিভাগ, বহু সংগঠন, প্রখ্যাত কয়েকজন সাংবাদিক ও আইনজীবী তাঁদের এই আন্দোলনে নানাভাবে সাহায্য করেছেন ও করছেন। প্রতিরোধ কমিটির অন্য যুগ্ম সম্পাদক কনক সরদার জানালেন এলাকার দু'একজন উচ্চ পদাধিকারী অবশ্য তাঁদের আন্দোলনের বিরোধিতা করছেন। যদিও এই বিরোধিতা এখনও খুব একটা প্রকাশ্যে নয়। তবে আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে নানা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। প্রচ্ছন্ন হুমকিও দেওয়া হচ্ছে গ্রেপ্তারের। তিনি আরও বললেন, তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করছেন অথচ কর্তৃপক্ষ আন্দোলনের চরিত্র সম্পর্কে প্রশাসনের উঁচু মহলে বিভ্রান্তিকর অভিযোগ পাঠাচ্ছেন। তাছাড়া এলাকার বাতাসে একটা গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—"উক্ত কারখানাকর্তৃপক্ষের কারো সঙ্গে জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও জনৈক রাজ্যমন্ত্রীর পরিচিতি অথবা আত্মীয়তা আছে। সুতরাং এলাকার সব মানুষ না চাইলেও কারখানা হবেই।"

অন্যদিকে দেখেছি এলাকার রিক্সাভ্যান চালক, চা-তেলেভাজা দোকানী, গরীব কৃষক থেকে শুরু ক'রে উচ্চ শিক্ষিত মানুষ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-ছাত্রী এমনকি গৃহবধূ পর্যন্ত প্রস্তাবিত জায়গায় সার কারখানা স্থাপনের ঘোরতর বিরোধী। রিক্সাভ্যান চালক শ্যামাপদ হালদার হয়তো পরিবেশ দূষণ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানে না তবু সে বললো—"গাঁয়ের কাছে

সার কারখানা কেন, যেখানে লোকবসতি নেই, নদী আছে সেখানে যাক না।"

সবচেয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হল—সাধারণত কলকারখানায় দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর কিংবা কারখানাজাত দূষণ সৃষ্টি হবার পর তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে। যেমন ভূপালে দুর্ঘটনা ঘটার পরে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্মীকান্তপুর এলাকার এই আন্দোলন কারখানা স্থাপনের আগেই শুরু হয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে কোন কারখানা একবার স্থাপিত হয়ে গেলে, তা যতই জনবিরোধী বা ক্ষতিকারক হোক, তার বিরুদ্ধে কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। মনে হয় সেই কারণেই "মন্দির বাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি" একেবারে গোড়াতেই কাজ শুরু করেছেন।

যাই হোক, এই জোরদার আন্দোলনের ফলে কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক কাজকর্মও সম্পূর্ণ করতে পারেন নি এখনও। প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে তাঁরা সবে জমি কেনা শুরু করেছিলেন। কিছু জমি কিনেছেনও। কিন্তু সেগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। তাঁদের কম করে দরকার 120 বিঘা। আজ পর্যন্ত এর অর্ধেকও কেনা যায়নি। কারণ আন্দোলন শুরু হতেই জমির মালিকরা জমি বেচা বন্ধ করেছেন। তখন ভয় দেখিয়ে, দাম বাড়িয়ে, চাকরী দেওয়ার লোভ দেখিয়ে জমি কেনার চেষ্টা হয়। বলা বাহুল্য সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে।

—প্রতিবেদক □

With best compliments from :

Nepal Chakraborty

Govt. Contractor, Building & Road Specialist

Surjya Nagar
P.O. Alipurduar Cant.
Dist-Jalpaiguri

Phone No. Kalyani 487

With Compliments from :

M. R. DAS & SONS.

GOVT. CONTRACTOR

All kinds of Iron Metal, Drums & Corrugate & Drum Sheet Merchants & Tubewell parts Supplier, Govt. Plumbing and Sanitary Contractor & Building Materials Suppliers.

457/A, Masjid Bati Road,
(Milannagar Katgola)
P. O. Kanchrapara
24 Parganas.

With Best Wishes from :

Ranjit Chandra Dhar

Specialist In Road & Building
P. W. D. Enlisted Class III Contractor,

Babupara, P.O. Alipurduar,
Dist.-Jalpaiguri, West Bengal

R.N.34929/79
YEAR 10 NUMBER 6
YEAR 11 NUMBER 1

A bi-monthly magazine
VIGYAN-O-VIGYANKARMI
c/o D. S. Enterprise,
52/9C, B. B. Ganguli Street, Cal-12
May-August 1987

With Compliments from :

Lakshmi Construction

&

Boney Construction

136, Basanta Babu Road,
Kanchrapara
24 Parganas (North)
WEST BENGAL

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে লক্ষ্মী প্রেস, 15/সি, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-9, থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।